ছায়ালীন

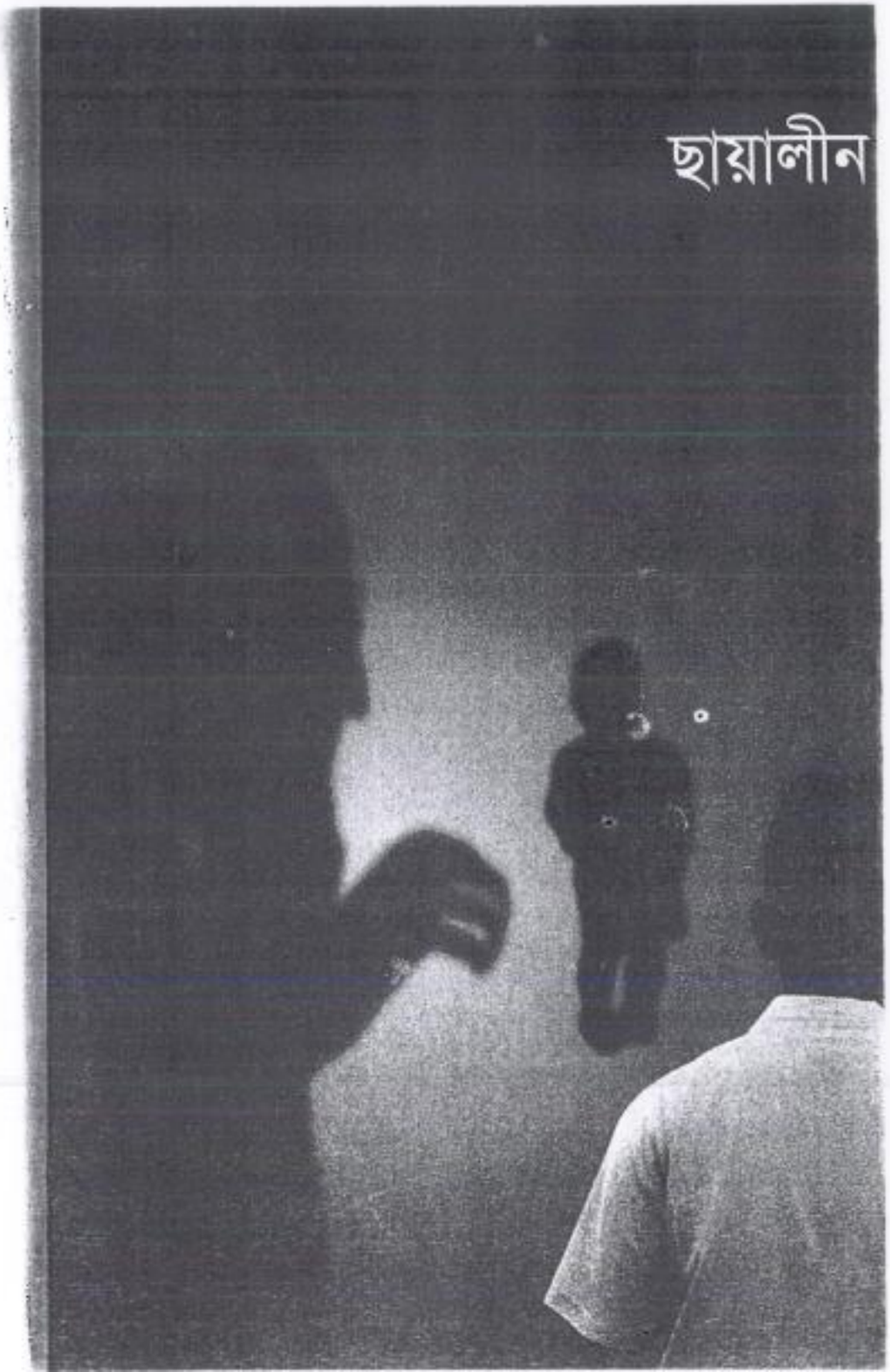

ছায়ালীন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

উৎসর্গ

হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম

যেই বয়সে একজন মাথার চুলে জেল দিয়ে কলসার্টে যায়
সেই বয়সে অস্ত্র হাতে দেশের জন্যে যুদ্ধ করে বীর বিক্রম হয়েছেন।
এরকম একজন মানুষের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে
সেই গর্বে আমার মাটিতে পা পড়ে না।

ছায়ালীন ॥ মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পঞ্চম মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৮
চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৭। তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রকাশক : রেহানা হক। সুবর্ণ ১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম (দোতলা) ঢাকা ১০০০
কম্পোজ : বাংলাবাজার কম্পিউটার ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস, শিরিষ দাস লেন ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। স্বত্ব : লেখক

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

বিক্রয় কেন্দ্র : সুবর্ণ □ ইসলামী টাওয়ার ১১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০। রুম নং □ ২

ISBN 984 459 079 5

সূচিপত্র

চক্র ৯
আংটি ১৪
মুকিদ আলীর শেষ পর্ব ২২
টেলিভিশন ৩১
ছায়ালীন ৪৬
দানব ৭০

চক্র

মাঝরাতে হঠাৎ কী খেয়াল হলো, নীতু বলল, "আয় চক্রে বসি।"

সাথে সাথে সবাই হই হই করে বলল, "চল, চল বসি।"

গরমের ছুটির শেষে মাত্র সবাই হোস্টেলে ফিরে এসেছে, ক্লাশের চাপ এখনো পুরোপুরি চেপে বসে নি। প্রতি রাতেই সবাই বসে গল্প গুজব করতে করতে রাত গভীর করে ফেলে, ছুটিতে কী হয়েছে সেটা নিয়ে সবারই কিছু না কিছু বলার আছে। অতি সাধারণ ঘটনা সেটা শুনেই সবাই হেসে কুটি কুটি হয়। গরমের ছুটিতে মৌসুমী নামের মেয়েটিরই শুধুমাত্র সত্যিকার অর্থে বলার মতো একটি ঘটনা রয়েছে। তার দূর সম্পর্কের এক চাচা বেড়াতে এসে সবাইকে নিয়ে চক্রে বসে মৃত আত্মাদের ডেকে এনেছিলেন। চক্রে বসা মানুষদের ওপর আশ্রয় নিয়ে মৃত আত্মারা কথা বার্ত্তা বলেছে, মৌসুমীর নিজের চোখে দেখা ঘটনা অবিশ্বাস করার উপায় নেই।

ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের আড্ডায় গল্পটি এর মাঝে অনেক বার শোনা হয়ে গেছে এবং আজ রাতে ঠিক যখন আড্ডা ভাঙ্গার সময় এসেছে তখন নীতু এই চক্রে বসার প্রস্তাবটি করেছে। শাহানা দুর্বলভাবে একটু আপত্তি করল, বলল, "কিন্তু কীভাবে চক্রে বসতে হয় আমরা তো জানি না।"

নীতু বলল, "কে বলেছে জানি না? মৌসুমী আমাদের বলল না?"

কথাটি সত্যি, কীভাবে চক্রে বসতে হয় বিষয়টা মৌসুমী এর মাঝে বেশ কয়েকবার সবার কাছে বর্ণনা করে ফেলেছে। ভীতু প্রকৃতির কয়েকজন মেয়ে তার পরেও দুর্বল ভাবে একটু আপত্তি করল কিন্তু অন্যদের প্রবল উৎসাহে সেই আপত্তি জায়গা করতে পারল না।

তাই কিছুক্ষণের মাঝে নওরীনের রুমের খাটগুলো পিছনে ঠেলে জায়গা করা হলো, টেবিল ধাক্কা দিয়ে কোনায় সরিয়ে নেয়া হলো, চেয়ারগুলো ঘর থেকে বের করা হলো এবং ঘরের মেঝেতে একটা বড় চাদর বিছিয়ে সবাই গোল হয়ে বসে গেল। ঘরের আলো নিভিয়ে ছোট একটা পিরিচে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নেয়া হয়েছে। মোমবাতির আলোর কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক বেশ সহজেই ঘরের ভেতরে কেমন যেন একটা ছমছমে আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল।

নীতু বলল, "সবাই সামনে হাত রাখ, একজনের বাম হাতের ওপর আরেকজনের ডান হাত। তাই না রে মৌসুমী?"

মৌসুমী মাথা নাড়ল।

শাহানা জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করব?"

মৌসুমী বলল, "চোখ বন্ধ করে মৃত মানুষের কথা ভাবতে থাক।"

"কোন মৃত মানুষের কথা ভাবব?"

নীতু ধমক দিয়ে বলল, "তোর যাকে ইচ্ছা।"

শাহানা বলল, "আমি মরা মানুষের কথা ভাবতে পারব না। আমার ভয় করে।"

"ভয় করলে চুপ করে বসে থাক। অন্যদের ডিস্টার্ব করবি না।"

মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতেই ঘরের ভেতরে একটা আবছা অন্ধকার নেমে আসে। সাথে সাথে শাহানা হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "না না ভাই। আমি বসব না। আমার ভয় করে।"

নীতু ধমক দিয়ে বলল, "এতোগুলো মানুষ বসে আছে, তার মাঝে তোর ভয়টা কিসের?"

শাহানা যুক্তিতর্কের মাঝে গেল না, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি বসব না বাবা আমি যাই। আমার এসব ভাল লাগে না।"

সত্যি সত্যি শাহানা দরজা খুলে বের হয়ে যায়। নীতু পিছন থেকে বলল, "দাঁড়া। আগে প্রেতাত্মারা আসুক। আমরা যদি তাদেরকে তোর ঘরে না পাঠাই।"

শাহানা চলে যাবার পর অন্যেরা খানিকক্ষণ শাহানাকে নিয়ে গজগজ করে আবার চক্রে বসে পড়ে। একজনের হাতের ওপর অন্যজনের হাত রেখে তারা মৃত মানুষের কথা ভাবতে থাকে। ঘর অন্ধকার, সবার চোখ বন্ধ এবং মাথা নিচু, দেখতে দেখতে ঘরের ভেতর এক ধরনের আধিভৌতিক পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

মৌসুমীর গল্পে চক্রে বসার বিষয়টি যেরকম ভাবগম্ভীর এবং চমকপ্রদ ছিল এখানে অবশ্যি মোটেও সেটা এরকম হলো না। যারা বসেছে তাদের মাঝে মিতুলের একটু হাসির রোগ আছে এবং দেখা গেলো কিছুক্ষণের মাঝেই সে হাসতে শুরু করে দেয়। হাসিটা গোপন রাখার জন্যে সে প্রাণপন চেষ্টা করে কিন্তু তার শরীর কাঁপতে থাকে এবং মাঝে মাঝে মুখ থেকে বিদঘুটে একটা দুইটা শব্দ বের হয়ে আসে। মধ্যরাত্রিতে চক্রে বসে মেয়েরা দ্বিতীয় একটা জিনিষ আবিষ্কার করল, সেটা হচ্ছে হাসি অত্যন্ত সংক্রামক একটি রোগ। এবং মিতুলের দেখাদেখি নাজু, নওরীন আর সাথী দিয়ে শুরু করে একটু পরে নীতু আর মৌসুমীর মতো এক দুইজন সিরিয়াস মেয়ে ছাড়া অন্য সবাই গা দুলিয়ে হাসতে শুরু করে দেয়।

মৃত আত্মারা নিশ্চয়ই কৌতুক প্রিয় মেয়েদের মাঝে আসতে পছন্দ করে না, তাই ঘণ্টা খানেক পরে সবাই আবিষ্কার করল রাত গভীর থেকে

গভীরতর হয়েছে কিন্তু তাদের কেউ মিডিয়াম হয়ে কোন আত্মাকে আনতে পারে নি।

মৌসুমী বিরক্ত হয়ে বলল, "অনেক হয়েছে। এখন শেষ কর।"

নীতু বলল, "তোদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না। চক্রে বসেও শুধু ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাসিস।"

মৌসুমী বলল, "এটা মোটেও হাসির ব্যাপার না। এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার।"

মিতুল হাসি চেপে বলল, "হাসি উঠে গেলে আমি কী করব?"

নীতু রেগে বলল, "হাসি ওঠে গেলে এরকম জায়গায় আসবি না।"

মৌসুমী বলল, "আমার চাচা বলেছেন চক্রে মৃত আত্মা আনার পর ঠাট্টা তামাশা করলে আত্মার কষ্ট হয়।"

মিতুল বলল, তাহলে মৃত আত্মা না এলে জীবন্ত আত্মা আনলেই হয়।"

নীতু বলল, "জীবন্ত আত্মাটা কী জিনিষ।"

"যে মানুষ মারা যায় নাই তার আত্মা।" জীবন্ত মানুষের আত্মা আনার পুরো ব্যাপারটি মিতুলের কাছে খুব কৌতুকের মনে হলো এবং সেটা কল্পনা করে সে হি হি করে হাসতে শুরু করল।

নওরীন বলল, "আচ্ছা! মিতুল তো ঠিকই বলেছে। চক্রে বসে যদি জীবন্ত মানুষের আত্মা আনার চেষ্টা করি তাহলে কী হবে?"

মৌসুমী বিরক্ত হয়ে বলল, "ফাজলেমি করবি না। চক্রে বসে ডাকা হয় মৃত আত্মাদের—"

"আমরা ডাকব জীবন্ত মানুষের আত্মাদের।"

মিতুল হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, "আয় আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করে ফেলি। চক্রে বসে আমরা শাহানাকে ডাকি! দেখি এই ভীতুর ডিমটার ঘুম ভেঙ্গে যায় কী না!"

মৌসুমী বলল, "দেখ। চক্র ব্যাপারটা হাসি তামাশার না। এটা সিরিয়াস ব্যাপার। এটা নিয়ে ফাজলেমি করবি না।"

"আমরা ফাজলেমী করছি কে বলল?" মিতুল বলল, "আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। মৃত মানুষের আত্মাকে না ডেকে জীবন্ত মানুষের আত্মাকে ডাকছি। জীবন্ত মানুষকে পরে জিজ্ঞেস করব সে কিছু টের পেয়েছে কী না!"

খানিকক্ষণ এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হলো এবং শেষ পর্যন্ত সবাই আবার চক্রে বসতে রাজী হলো, তবে এবারে মৃত মানুষকে না ডেকে জীবন্ত মানুষকে ডাকা হবে। কোন জীবন্ত মানুষকে ডাকা হবে সেটা নিয়ে অবশ্যি কোন তর্ক বিতর্ক হলো না! শাহানাই হবে সেই মানুষ।

ঘরের বাতি নিভিয়ে আবার তারা গোল হয়ে বসে। একজনের হাতের ওপর আরেকজন হাত রেখে চোখ বন্ধ করে তারা শাহানার কথা ভাবতে থাকে। মিতুল পর্যন্ত হাসি বন্ধ করে রইল, মৌসুমী ফিস ফিস করে বলল, "শাহানা! আমরা তোমাকে চক্রে আহ্বান করছি। তুমি আস! তুমি আস আমাদের মাঝে।"

মিনিট দশেক এভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। তাদের মাঝে সবচেয়ে শান্ত শিষ্ট মেয়ে নাজু হঠাৎ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে, মনে হতে থাকে তার বুঝি নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শুধু তাই নয় তার শরীরটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে, পাশে বসে থাকা নওরীন একটু ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই নাজু! কী হয়েছে তোর?"

নাজু কোনো কথা বলল না, শুধু তার নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে, শরীরটা আরো জোরে কাঁপতে থাকে। মুখ দিয়ে হঠাৎ গোঙানোর মতো এক ধরনের শব্দ হতে থাকে।

নীতু জিজ্ঞেস করল, "নাজু। কী হয়েছে তোর?"

নাজু কোনো উত্তর করল না।

নীতু আবার ডাকলো, "নাজু। এই নাজু।"

নাজু এবারে উত্তর দেয়, চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলে, "আমি নাজু না।"

"তাহলে তুই কে?"

"আমি শাহানা।"

সবাই কেমন জানি চমকে উঠল। মৌসুমী বলল, "তুই এখানে কী করছিস?"

"তোরা আমাকে ডেকেছিস, তাই আমি এসেছি। তোরা বল কেন আমাকে ডেকেছিস কেন?"

তারা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, শুধু যে কণ্ঠস্বর হুবহু শাহানার মতো তা নয়, কথা বলার ভঙ্গী এমন কী কথায় রাজশাহী অঞ্চলের টানটুকু পর্যন্ত আছে। মৌসুমী বলল, "তুই আসলেই শাহানা?"

"হ্যাঁ।"

"তোর কেমন লাগছে?"

"ভাল লাগছে না।"

"কেন ভাল লাগছে না?"

শাহানার গলার স্বরটা হঠাৎ কেমন জানি হাহাকারের মতো শোনায়। ভাঙ্গা গলায় বলল, "তোরা কেন আমাকে ডাকলি? কেন?"

শাহানার গলার স্বরে নাজু হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। মৌসুমী ভয় পাওয়া গলায় বলল, "চক্র ভেঙ্গে দাও সবাই। হাত ছেড়ে দাও।"

সবাই তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল, প্রায় সাথে সাথেই নাজু কান্না বন্ধ করে মাথা তুলে তাকালো। নীতু গিয়ে ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দেয়, হঠাৎ করে আলো জ্বালানোয় সবারই চোখ সয়ে যেতে একটু সময় লাগে। সবাই নাজুর মুখের দিকে তাকালো। নীতু জিজ্ঞেস করল, "নাজু তোর কী হয়েছিল?"

নাজুকে কেমন যেন বিচলিত দেখায়, শুকনো মুখে বলল, "আমি জানি না। আমার স্পষ্ট মনে হল—"

"কী মনে হল?"

নাজু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "আয় আগে দেখি শাহানা কী করছে।"

"ঠিকই বলেছিস," বলে নীতু দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে আসে। করিডোরের শেষ মাথায় শাহানার সিঙ্গেল সিটেড রুম। তারা দ্রুত পায়ে শাহানার রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীতু দরজায় শব্দ করে ডাকল, "শাহানা।"

ভেতর থেকে কোনো শব্দ হল না। তখন নীতু আরো জোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই শাহানা। শাহানা—"

শাহানা তবুও জেগে উঠলো না। তখন অন্যেরাও দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করে, ভয় পাওয়া গলায় ডাকতে থাকে," শাহানা! দরজা খোল শাহানা!"

তাদের হৈ চৈ শুনে আশে পাশের রুম থেকে অন্যেরা জেগে উঠে ভীড় করে তবু শাহানা ঘুম থেকে জাগে না। ভয় পেয়ে এবারে একসাথে কয়েকজন মিলে দরজায় ধাক্কা দেয়। কয়েকবার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিতেই দরজার ছিটকানী ভেঙ্গে হঠাৎ করে দরজাটা খুলে যায়।

মেয়েরা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো। একজন লাইট সুইচটা টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল। মশারীর ভেতর এক ধরনের অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে শাহানা উপুর হয়ে শুয়ে আছে। নীতু ছুটে গিয়ে শাহানাকে ঘুরিয়ে নেয়—তার চোখ দুটো আধখোলা সেখানে শূন্য দৃষ্টি। মুখটা অল্প একটু ফাঁক হয়ে জিব খানিকটা বের হয়ে আছে।

নীতু একটা আর্ত চিৎকার করে পিছনে সরে আসে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে থর থর করে কাঁপতে থাকে।

বিছানায় শুয়ে শাহানার মৃতদেহ শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। চক্রে বসে সত্যি সত্যি তারা শাহানার আত্মাটিকে বের করে এনেছে।

আংটি

কফিল উদ্দিন পকেট থেকে চিরুনীটা বের করে তার চুলের ওপর দিয়ে আলতোভাবে একবার বুলিয়ে নিল, এই চেহারাটা তার একটা বড় সম্পদ তাই সে এটার যত্ন আত্তি করে। সে রীতিমতো জেলখাটা ঘাঘু অপরাধী কিন্তু তার চেহারার মাঝে মফস্বল কলেজের বাংলা শিক্ষকের নির্দোষ একটা সারল্য আছে। মানুষ তার চেহারা দেখে তাকে বিশ্বাস করে এবং কফিল উদ্দিন সেই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগায়। এখন পর্যন্ত তার হাতে কেউ খুন হয়ে যায় নি কিন্তু মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে সে তার জীবনে অনেককে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিয়েছে।

এই মূহুর্তে কফিল উদ্দিন কমলাপুর রেল স্টেশনে টিকেট কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারায় সে একটু বিব্রত এবং হতচকিত ভাব ফুটিয়ে রেখেছে যদিও সে ভেতরে ভেতরে একেবারে একশভাগ সজাগ। সে একটি শিকার খুঁজছে যাকে আজরাতে সে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দেবে। ট্রেনের টিকেট খুঁজতে এসেছে এরকম মানুষকে সে ভেতরে ভেতরে যাচাই করে দেখছে। প্রথম ষণ্ডা গোছের মানুষটাকে সে বাতিল করে দিল, দ্বিতীয় মানুষটিকে শেষ মূহুর্তে বাতিল করে দিল কারণ মনে হলো তার কাছে টাকাপয়সা বেশি থাকবে না। তৃতীয় মানুষটিকে তার বেশ পছন্দ হল এবং সে মাকড়শার সতর্ক পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে যায়। মানুষটা টিকেট কাউন্টারে যাবার আগেই তাকে ধরতে হবে। কাছাকাছি গিয়ে কফিল উদ্দীন বলল, "শুনছেন?"

"জী। আমাকে বলছেন?"

"হ্যাঁ। ইয়ে—আমি একটা ছোট ঝামেলার মাঝে পড়েছি।" কফিল উদ্দিন মুখে চমৎকার একটা বিব্রতভাব ফুটিয়ে তুললো।

"কী ঝামেলা?"

"আমার আর এক বন্ধুর আজ রাতে সিলেট যাবার কথা। ফাষ্টক্লাশ বার্থে দুইটা টিকেট ছিল। একটু আগে ফোন করে বলল সে আসতে পারছে না—"

মানুষটির চোখ উজ্জল হয়ে উঠল, "আপনার কাছে স্লিপিং বার্থের একটা টিকেট আছে?"

কফিল উদ্দিন বিব্রতভাবে বলল, "হ্যাঁ। আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—অবশ্যই।"

কফিল উদ্দিন পকেট থেকে টিকেটটা বের করে মানুষটির হাতে দিল, সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মুখে সন্তুষ্টির ভান করে তার মানি ব্যাগে হাত দেয়। কফিল উদ্দিন বলল, "আপনাকে এখনই দিতে হবে না। আমিও তো যাচ্ছি। ট্রেনে সারা রাত একসাথে থাকব পরে দিয়ে দিবেন।"

মানুষটি বলল, "না, না। এখনই দিয়ে দিই।" সে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে, কফিল উদ্দিন নিস্পৃহ ভঙ্গী করে কিন্তু উত্তেজিত হয়ে লক্ষ করল মানিব্যাগটা মোটা, সেখানে থরে থরে নোট সাজানো। মানুষটার সাথে একটা হ্যান্ড ব্যাগ, ভারী হ্যান্ডব্যাগ—ভেতরে নিশ্চয়ই ভাল জিনিষপত্র আছে। হাতে আংটি আর ঘড়ি, পকেটে মোবাইল ফোন, কফিল উদ্দিন দ্রুত হিসেব করে দেখল আজ রাতের দাওটি খারাপ হবার কথা না। এখন সব ভালয় ভালয় শেষ করতে পারলে হয়।

দুজনের কেবিন, নিচের বার্থ কফিল উদ্দিনের উপরের বার্থটা মানুষটির। দুজনে যখন আরাম করে বসেছে তখন লম্বা হুইসিল দিয়ে ট্রেনটা মোটামুটি সময়মতো ছেড়ে দিল, এটেনডেন্ট এসে মাথা ঢুকিয়ে বলল, "স্যার আপনারা কিন্তু রাত্রে জানালা বন্ধ রাখবেন।"

কফিল উদ্দিন বলল, "তুমি চিন্তা করো না। আমরা বন্ধ করে দেব।"

"চোর ছ্যাচরে দেশ ভরে গেছে স্যার।"

এটেনডেন্ট চলে যাবার পর কফিল উদ্দিন একটা হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, বলল, "দেশের অবস্থটা দেখেছেন? একজন মানুষ ট্রেনের জানালা খোলা রেখে ট্রাভেল করতে পারে না।"

সঙ্গী মানুষটি বলল, "কোন জায়গায় জানালা খোলা রাখতে পারে?"

কফিল উদ্দিন মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক।" তারপর সে ঢাকা শহরে আসার পর একজন মানুষ কীভাবে অপরাধীর পাল্লায় সর্বস্বান্ত হয়েছে তার একটা নিখুঁত বর্ণনা দিল। বানানো গল্প কিন্তু এই মানুষটার সেটা বোঝা সম্ভব না। সবকিছু পরিকল্পনা মতো চলতে থাকলে এখন এই মানুষটারও ব্যক্তিগাত অভিজ্ঞতা থেকে একটা গল্প বলার কথা, কিন্তু মানুষটি তার চেষ্টা করল না। সম্ভবত নিজের গাড়িতে চলাচল করে, হাইজ্যাক ছিনতাই দেখে নি।

কফিল উদ্দিন তার ব্যাগ খুলে একটা ইংরেজী বই বের করল—তার পড়াশোনা নেই। বানান করেও ইংরেজী পড়তে পারে না কিন্তু এই মানুষটার বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে এগুলো দরকার। বইটা সীটের উপর উপুর করে রেখে সে পকেট থেকে মোবাইল টেলিফোন বের করে একটা নম্বর ডায়াল করে তার কাল্পনিক স্ত্রীর সাথে কথা বলার অভিনয় শুরু করে, "রুমানা?"

প্রথমে কিছু একটা শোনার অভিনয় করল, বলল, "না, না কিছু দরকার নেই—এতো সকালে বেচারা ড্রাইভারের ষ্টেশনে আসার কোনো দরকার নেই। আমি একটা স্কুটার নিয়ে নেব।" আবার কিছুক্ষণের বিরতি দিয়ে এবং হুঁ হাঁ করে জিজ্ঞেস করল, "তিন্নি কী করে? দাও দেখি তার সাথে একটু কথা বলি।" কফিল উদ্দিন তারপর একটা ছোট মেয়ের সাথে খানিক্ষণ কাল্পনিক কথা বার্ত্তা বলল। সঙ্গী মানুষটি পুরো কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়ে না শুনলেও যেটুকু শুনেছে তাতেই তাকে একজন সচ্ছল ভালমানুষ বিবাহিত সুখী পারিবারিক মানুষ হিসেবে ধরে নেবে।

মোবাইল টেলিফোনটা রেখে কফিল উদ্দিন সঙ্গী মানুষটার সাথে আবার একটু আধটু কথাবার্ত্তা বলে, মানুষটি একটু কম কথার মানুষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলাপে টেনে আনা গেলো। প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করে, নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক। স্ত্রীকে নিশ্চয়ই খুব ভালবাসে, কারণ, তার কথা বলার সময় আঙ্গুলের আংটিটাতে বারবার হাত বুলিয়ে দেখলো। নিশ্চয়ই বিয়ের আংটি, কফিল উদ্দিনও আড়চোখে আংটিটা দেখে, খাঁটি সোনার মোটা একটা আংটি, দামী পাথরও আছে! শুধু এই আংটির জন্যেই এই মানুষের উপর একটা দাও মারা যায়।

ঘন্টাখানেকের ভেতরেই কফিল উদ্দিন মানুষটার সাথে আন্তরিকতার একটা পর্যায়ে পৌছে যায়। দুজন দুজনের সাথে ছোটখাটো ব্যক্তিগত কথা বলল হালকা দু একটা রসিকতাও করা হলো এবং যখন মনে হলো পরিবেশটা পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েছে তখন কফিল উদ্দিন তার আসল কাজ শুরু করে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "খিদে লেগে গিয়েছে। খেয়ে আসতে পারি নি। আপনি খেয়েছেন?"

"হ্যাঁ খেয়েছি।"

"আমি আসার সময় ফাস্টফুডের দোকান থেকে কয়টা স্যান্ডউইচ তুলে এনেছি। একটু খেয়ে নিই যদি কিছু মনে না করেন?"

"না, না—আমি কী মনে করব? আপনি খান।"

কফিল তার ব্যাগ থেকে একটা খাবারের প্যাকেট বের করল, কয়েকটা স্যান্ডউইচ পাশাপাশি সাজানো—প্রথমটাতে ধুতুরার বিষ মেশানো। অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছে বাজারের অন্য বিষের তুলনায় এখনো ধুতুরার বিষটাই ভাল, কোন গন্ধ নেই, তিতকুটে স্বাদ নেই, মানুষকে সহজে খাইয়ে নেয়া যায়।

কফিল স্যান্ডউইচের প্যাকেটটা এক নজর দেখে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "অনেকগুলো দিয়েছে দেখি। খাবেন একটা?"

মানুষ যদি একটা তুলে নেয় প্রথমটাই নেবে, সেটাই ধুতুরার বিষ দেয়া। কিন্তু মানুষটা নিল না। বলল, "না, না, আমি খেয়ে এসেছি। থ্যাংক ইউ।"

কফিল আর জোর করল না, বলল, "খেয়ে এসে থাকলে খামোখা স্যান্ডউইচ খেয়ে মুখ নষ্ট করবেন না।" সে প্যাকেট থেকে দ্বিতীয় স্যান্ডউইচটা তুলে খেতে শুরু করে। খেতে খেতে সে বাঙালির খাওয়ার অভ্যাস নিয়ে একটু রসিকতা করল, "বুঝলেন? ভেতো বাঙ্গালী তো স্যান্ডউইচ খেলে পেট ভরে না! এই খাবারটা যে কারা আবিষ্কার করেছে!"

মানুষটি হাসল, বলল, "বিপদে পড়ে খেতে হয়। শখ করে কে আর কোনদিন স্যান্ডউইচ খেয়েছে?"

"তা ঠিক।" কফিল উদ্দিন প্যাকেট থেকে দুটি কোল্ড ড্রিংকের এলুমিনিয়ামের ক্যান বের করল, একটার মাঝে ধুতুরার বিষ মেশানো। দ্বিতীয়টা ভালো। সে মানুষটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেন, একটা ড্রিংকস খান।"

শতকরা নব্বুই ভাগ চান্স যে মানুষটা কোল্ড ড্রিংসটা নেবে। সত্যি সত্যি নিলো এবং ধুতুরার বিষ মেশানোটাই। ক্যানটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেও মানুষটা বুঝতে পারবে না যে একটা সূক্ষ্ম ফুটো করে এখানে ইনজেকশানের সিরিঞ্জ দিয়ে ধুতুরার বিষ ঢোকানো হয়েছে। ফুটোটা নিখুঁতভাবে ইপক্সি দিয়ে বুঁজে দেয়া আছে।

মানুষটা ক্যান হাতে নিয়ে সেটা খুলে ঢক ঢক করে খানিকটা ড্রিংক খেয়ে নেয় এবং সাথে সাথে কফিল তার বুকের ভেতর থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস বের করে দেয়। কাজ হয়ে গেছে এখন শুধু সময়ের ব্যাপার, মানুষটা যখন ঘুম থেকে উঠবে—সম্ভবত কোন একটা হাসপাতালে তখন অবাক হয়ে বোঝার চেষ্টা করবে কেমন করে সে এখানে এসেছে!

কফিল আড়চোখে মানুষটাকে লক্ষ্য করে, ক্যান থেকে ঢক ঢক করে আরো খানিকটা ড্রিংকস খেয়ে হঠাৎ কেমন যেন একটু অবাক হয়ে কফিল উদ্দিনের দিকে তাকালো। কফিল উদ্দিন তার দৃষ্টি এড়িয়ে জানালা দিয়ে তাকালো। মানুষটা জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে কেমন যেন বিচিত্রভাবে চোখ পিট পিট করতে থাকে। কফিল একটু সরে গিয়ে বলল, "ঘুম পাচ্ছে? শুয়ে পড়ুন তাহলে। অনেক রাত হয়েছে?"

মানুষটি কেমন যেন অস্বস্তির ভাব করে মাথা নাড়ে, এদিক সেদিক তাকায়, তারপর বিড় বিড় করে বলে, "শরীরটা ভাল লাগছে না।"

"তাই নাকি?" কফিল উদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "শুয়ে থাকেন—কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন তাহলে।"

মানুষটি বিড় বিড় করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে ওঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কেমন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। কফিল মানুষটাকে বার্থে তুলে দেয়, মাথায় নিচে একটা বালিশ গুজে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও সোনার চাঁদ।"

কফিল কেবিনের লাইটটি নিভিয়ে দিতেই জানালা দিয়ে ভেতরে জোৎস্নার একটা নরম আলো এসে ঢুকলো, কফিল উদ্দিন খানিকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল জোৎস্নার আলোতে বাইরে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এটা কি সুন্দর নাকি অসুন্দর সে বুঝতে পারে না।

কফিল কোন তাড়াহুড়ো করল না। ঘণ্টাখানেক পর সে কেবিনে, লাইট জ্বালিয়ে মানুষটাকে পরীক্ষা করার জন্যে গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল, মানুষের শরীরটা আশ্চর্য রকম শীতল। সে ভয়ে ভয়ে মানুষটার দিকে তাকাল, মানুষটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে আবার সে মানুষটার বুকে হাত দিল, হৃৎস্পন্দনের কোন চিহ্ন নেই। হঠাৎ করে ভয়াবহ আতংকে কফিল লাফিয়ে পিছনে সরে আসে। সর্বনাশ! এই মানুষটা মরে গেছে।

কফিল উদ্দিনের ইচ্ছে হল ভয়ংকর একটা চিৎকার করে কেবিনের দরজা খুলে বের হয়ে যায়, কিন্তু সে জানে এটা সে করতে পারবে না। তাকে এখন এই মৃত মানুষের দেহটি নিয়ে এই কেবিনে বসে থাকতে হবে। কফিল উদ্দিন হঠাৎ কুল কুল করে ঘামতে থাকে।

অনেক কষ্ট করে কফিল উদ্দিন নিজেকে শান্ত করল। এখন যদি সে নিজের মাথা ঠাণ্ডা না রাখে তাহলে ভয়ানক বিপদে পড়ে যেতে হবে। যেভাবেই হোক তাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, ঠাণ্ডা মাথায় খুব সাবধানে পরের স্টেশনে নেমে যেতে হবে। যতক্ষণ পরের স্টেশন না আসে ততক্ষণ তাকে চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

ঠিক তখন ট্রেনটা আস্তে আস্তে থেমে যায়, এখানে সে নেমে যেতে পারে, কিন্তু মানুষটার মানি ব্যাগ ঘড়ি আংটি কিছুই এখনো নেয়া হয় নি। এতো কষ্ট করে শেষে সে তো শুধু খালি হাতে নেমে যেতে পারে না। কফিল উদ্দিন মানুষটার পকেটে হাত দিয়ে তার মানি ব্যাগটা খুঁজতে থাকে ঠিক তখন জানালায় একজন মানুষের মুখ দেখা গেল, মানুষটি অবাক হয়ে ভেতরে তাকিয়ে আছে। কফিল উদ্দিন লাফিয়ে সরে এলো, জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী? কী চাও?"

"মিনারেল ওয়াটার লাগবে? ঠাণ্ডা মিনারেল ওয়াটার?"

"না না লাগবে না।"

মানুষটা সরে যাবার পরও সে জানালা থেকে সরল না। কেউ যেন দেখতে না পারে ভিতরে কী হচ্ছে।

একটু পরে ট্রেনটা আবার ছেড়ে দিলে কফিল উদ্দিন এসে মানুষটার পকেট থেকে মানি ব্যাগটা বের করে। ভেতরে নোটগুলো বেশির ভাগ পাঁচশ টাকার নোট, এখন গোনার সময় নেই কিন্তু চোখ বন্ধ করে আট দশ হাজার টাকা হয়ে যাবে। কফিল হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নেয়, বুক পকেট থেকে

মোবাইল টেলিফোনটা নেয়। বাম হাতের মাঝখানের আঙুলে তার বিয়ের আংটিটা খুলতে অনেক সময় নিল। আংটিটা শক্ত হয়ে আটকে গেছে টেনে খোলা যাচ্ছিল না, কফিল উদ্দিন একবার প্রায় হাল ছেড়েই দিচ্ছিল কিন্তু খাঁটি সোনার মোটাসোটা পাথর বসানো আংটিটার লোভ ছেড়ে দেয়া এতো সোজা নয়। টানাটানি করে শেষ পর্যন্ত আংটিটা ছুটিয়ে নিয়ে আসে। নিজের আঙুলে পরে দেখলো বেশ ফিট করে গেছে। কফিল উদ্দিন আংটিটা আর খুলল না, আঙুলে লাগিয়ে রেখে দিল।

কফিল উদ্দিন তারপর মানুষটার ব্যাগ খুললো। ভেতরে কাপড় জামা তোয়ালে এবং তার তলায় একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। কফিলের মুখে হাসি ফুটে উঠল, সে ল্যাপটপটা বের করে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়। এখন সে মোটামুটি ট্রেন থেকে নেমে যাবার জন্যে প্রস্তুত। মানুষটাকে মেরে ফেলার তার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না। মানুষটার সম্ভবত হার্টের সমস্যা ছিল। হয়তো এমনিতেই মারা যেতো—আজ ধুতুরার বিষ খেয়ে একটু আগে মারা পড়েছে।

কফিল উদ্দিন মানুষটার দিকে তাকালো, আধখোলা চোখ মুখটা অল্প একটু খোলা। গায়ের রংটা এর মাঝে কেমন জানি অসুস্থ নীলাভ হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে চোখ মুখ একটু ফুলেও এসেছে। কফিল উদ্দিনের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে—একটু আগেই মানুষটা বেঁচে ছিল তখন তাকে এতটুকু ভয় লাগে নি, কিন্তু এখন তার দিকে তাকাতেই তার শরীরটা কাটা দিয়ে উঠতে থাকে।

কফিল উদ্দিন কোথায় বসবে বুঝতে পারে না, মৃতদেহটির পাশে বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না, ওপরের বার্থে ওঠার সাহস করছে না। শেষ পর্যন্ত সে চাদরটা বিছিয়ে মেঝেতেই বসে পড়ল। এখন ট্রেনটা থামতেই সে নেমে পড়বে।

মেঝেতে বসে যাবার পর কফিল উদ্দিনের চোখ একটু পর পর মৃতদেহটার দিকে যেতে লাগল এবং প্রতিবারই সে চমকে উঠতে লাগল। একটি মৃতদেহ দেখে এতো ভয় লাগে কেন কে জানে? একবার ইচ্ছে হল বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করে, কিন্তু মৃতদেহটা রেখে দরজা খোলা রাখাও বিপদজনক। কেউ যদি ঢুকে গিয়ে দেখে ফেলে তখন কী হবে?

কফিল উদ্দিন কী করবে বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কেবিনের লাইট নিভিয়ে দিল, সাথে সাথে ভেতরে জোৎস্নার একটা নরম আলো আলো ছড়িয়ে পড়ে। আবছা অন্ধকারে হঠাৎ করে মৃতদেহের বিভীষিকাটা আড়াল হয়ে যায়। মানুষটাকে এখন আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। জোৎস্নায় আবছা আলোতে শুধু তার অবয়বটুক অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। কফিল উদ্দিন

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—এখন ট্রেনটা কোন একটা স্টেশনে থামতেই সে নেমে পড়বে।

ট্রেনটা থামার কোন লক্ষণ দেখালো না। গভীর রাতে জোৎস্নার আলোতে গ্রাম ক্ষেত নদী গাছপালা ভেঙ্গে ট্রেনটা ছুটে যেতে থাকে। কফিল উদ্দিন অপেক্ষা করতে থাকে, ঠিক কী কারণ জানা নেই তার ভেতরে হঠাৎ অন্য এক ধরনের আতংক এসে ভয় করে। অশরীরি আতংক।

কফিল উদ্দিন চোখ বুঁজে বসে থাকে, সে ভুলে যাবার চেষ্টা করে এই কেবিনের বার্থে একটা মৃতদেহ শুয়ে আছে এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করে ছোয়া যায় এরকম দূরত্বে সে মেঝেতে বসে অপেক্ষা করছে ট্রেনটি থামার জন্যে।

হঠাৎ তার মনে হলো কেউ তার ঘাড়ে স্পর্শ করেছে। কফিল উদ্দিন আতংকে চমকে উঠে চোখ খুলে তাকায় এবং একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে। জোৎস্নায় আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পেল সামনের বার্থে মৃতদেহটি উঠে বসেছে। চলন্ত ট্রেনটা দুলছে কিন্তু তার ভেতরে বসে থাকা মৃতদেহটি আশ্চর্য রকম স্থির। কফিল উদ্দিন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল এবং তার মাঝে দেখতে পেল মৃতদেহটি আবার হাত বাড়িয়ে তার ঘাড়টি স্পর্শ করেছে। ভয়ংকর আতংকে তার ছুটে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা তার মাঝে জেগে উঠল কিন্তু সে কোথায় ছুটে যাবে? কোনদিকে ছুটে যাবে।

মৃতদেহটি কিছু একটা বলছে, কথাটা সে শুনতে পেল না, কিন্তু অসুস্থ এক ধরনের দুর্গন্ধ তার নাকে এসে ধাক্কা দেয়। মৃতদেহটি আবার কথা বলল, খসখসে এক ধরনের কণ্ঠস্বর, চাপা গলায় বলছে, "আংটি।"

কফিল উদ্দিন কী করবে বুঝতে পারল না, মৃতদেহটি তার আংটিটি ফেরৎ চাইছে। সে পরিস্কার করে চিন্তা করতে পারছে না, বিকারগ্রস্থ মানুষের মতো সে তার আংটি খোলার চেষ্টা করে কিন্তু সেটা আঙুলে আটকে গেছে, টেনে খুলতে পারছে না।

মৃতদেহটি খপ করে তার কাঁধ ধরে নিজের দিকে টেনে এনে জড়িত গলায় বলল, "আংটি। আমার আংটি।"

ভয়ংকর আতংকে কফিল উদ্দিন চিৎকার করে উঠে কিন্তু মৃতদেহটির কোন ভাবান্তর হল না, লোহার মতো শক্ত শীতল হাতে তার বাম হাতটা ধরে মাঝের আংগুলটি নিজের দিকে নিতে থাকে। কিছু বোঝার আগে মৃতদেহটি তার আঙুলটি কামড়ে ধরে।

কফিল উদ্দিন প্রাণপনে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, নিজের ভেতরে শুধু একটা চিন্তা কাজ করছে, তার নিজেকে মুক্ত করতে হবে, যেভাবে হোক তাকে পালিয়ে যেতে হবে। প্রাণপনে সে নিজের হাতকে মুক্ত করে জানালা দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে—বাতাসে তখনো তার আর্তনাদ শোনা যেতে থাকে।

কেবিনের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে ট্রেনের কর্মকর্তারা একটা মৃতদেহকে আবিষ্কার করলেন। সেটি মেঝেতে উপুর হয়ে পড়ে আছে। সোজা করার পর দেখা গেল তার মুখে রক্ত।

কাছেই একটি আঙুল পড়ে আছে। দেখে মনে হয় কেউ আঙুলটি ছিঁড়ে শরীর থেকে আলাদা করেছে।

মৃতদেহটির পকেটে মানিব্যাগ, মোবাইল টেলিফোন বা হাতে ঘড়ি ছিল না—শুধু বাম হাতের মধ্যমাতে একটা আংটি ছিল। পাথর বসানো সোনার সুদর্শন একটি আংটি।

মুকিদ আলীর শেষ পর্ব

মুকিদ আলীর বাবা খুব শখ করে তার ছেলের নাম রেখেছিল মোহাম্মদ মুকিদ আলী, কিন্তু এখন তাকে কেউ সেই নামে চিনে না, সবাই তাকে ডাকে 'মুইক্কা চোরা'। মুকিদ আলীর মাঝে মাঝে যে এটা নিয়ে দুঃখ হয় না তা না। একসাথে চুরি করতে গিয়ে ইদরিস আলী ধরা পড়ল না বলে তার কিছু হলো না আর সে ধরা পড়ে গেলো বলে তার নাম হয়ে গেলো মুইক্কা চোরা। শুধু কি নাম? সবাই মিলে এমন মার মেরেছিল যে পুরো এক মাস তার বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। এখনো বাম পা'টাতে জোর পায় না একটু টেনে টেনে হাটতে হয়। কার্ত্তিক মাসের অভাবের সময় অন্য দশজনের মতো সেও ছোট খাটো চুরি-চামারী করেছে কিন্তু এটাই যে তার সত্যিকার পেশা হয়ে যাবে সেটা সে কোনোদিন কল্পনা করে নাই। নামের পিছনে চোরা শব্দটা লেগে যাবার পর তার আর কোনো উপায় থাকলো না, কেউ কাজ কর্ম দেয় না কোথাও গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় তাই শেষ পর্যন্ত এই কাজেই তাকে পাকাপাকি ভাবে লেগে যেতে হলো। এখন সে মোটামুটিভাবে চুরি চামারী করেই দিন কাটায়—তবে সমস্যা একটাই, আশেপাশে দশ গ্রামে কোনো বাড়িতে চুরি হলে থানাওয়ালারা প্রথমেই তাকে ধরে আনে, তারপর যা একটা পিটুনি দেয় তার কোনো মা-বাপ নেই। পাবলিকের মার তবু সহ্য করা যায় কিন্তু পুলিশের মার খুব কঠিন বস্তু।

চোর হলেও এই এলাকার মানুষ যে তাকে খুব হেলা ফেলা করে তা না। অন্য গ্রামে বি.এ. পাশ মাষ্টার আছে, দারোগা আছে, পাশ করা ডাক্তার আছে তাদের গ্রামের বিখ্যাত মানুষ বলতে এই মুইক্কা চোরা। কাজেই গ্রামের লোকজন তাকে অল্প বিস্তর খাতির করে। বলাইয়ের চায়ের দোকানে গেলে বলাই চোখ টিপে বলে, "কী রে মুইক্কা—আজকে কার সর্বনাশ করে আইলি?" মুকিদ আলী তখন দুর্বলভাবে হাসে কিছু বলে না। চোর মানুষদের কথা বলা ঠিক না, কেউ তাদের কথা বিশ্বাস করে না। বলাই তার সাথে একটু আধটু ইয়ারকি তামাশা করে ঠিকই, কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় না। ভিতরে গিয়ে বসলেও আপত্তিও করে না। মন মেজাজ ভাল থাকলে একটা কুকি বিস্কুট, আধখানা গজা বা এক কাপ চা খেতে দেয়।

আজকে সন্ধ্যেবেলা মুকিদ আলী বলাইয়ের চায়ের দোকানে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছে, যা একটা ঠাণ্ডা পড়েছে সে আর বলার মতো না। গরম চা আর একটা বিড়ি টেনেও শরীরটা ঠিক মতোন গরম হচ্ছে না। সাহস করে আরো এক কাপ চা চেয়ে ফেলবে কী না বুঝতে পারছিল না তখন গ্রামের মাতবর মোদাব্বের মুন্সী এসে ঢুকলো, সে কখনো একা চলা ফেরা করে না, সবসময়ে তার সাথে দুই একজন থাকে। আজকেও আছে, এই গ্রামেরই দুইজন—কুদ্দুস আর গহর আলী। সবাইকে নিয়ে একটা টেবিলে বসে চোখ ঘুরিয়ে সবার দিকে একবার তাকাতেই তার মুকিদ আলীর দিকে নজর পড়ল। মোদাব্বের মুন্সী ভুরু কুচকে বলল, "কীরে মুইক্কা তুই এইখানে? কবে ছাড়া পেলি?"

মুকিদ আলী হাত কচলে বলল, "বছর দুই হইছে চেয়ারম্যান সাহেব।"

"দুই বছর জেলের বাইরে? বলিস কীরে মুইক্কা?"

মুকিদ আলী কথা না বলে তার ময়লা হলুদ দাঁত বের করে একটু হাসার চেষ্টা করল।

"তা এইখানে কী মতলব? চুরি না অন্য কিছু?"

"কী যে বলেন চেয়ারম্যান সাহেব!" মুকিদ আলী নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, "জব্বর ঠাণ্ডা পড়ছে তাই ভাবলাম বলাই কাকার রেস্টুরেন্টে এক কাপ চা খায়া যাই।"

"তোদের আবার ঠাণ্ডা লাগে নাকি? মাঘ মাসের শীতে খালি গায়ে তেল মাইখ্যা চুরি করস না?"

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ ভাষায় দেয়া সম্ভব নয়, তাই মুকিদ আলী তার চেষ্টা করল না। হাসায় একটা দুর্বল ভঙ্গী করে বলল, "কী যে বলেন চেয়ারম্যান সাহেব!"

মোদাব্বের মুন্সী গ্রামের একজন গণ্যমান্য মানুষ, একটা চোরের সাথে তার বেশি সময় কথা বলা ঠিক না তাই সে হঠাৎ মুখটা কঠিন করে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। মুকিদ আলীকে যেন দেখতেই পায় নাই এরকম ভান করে বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলাই, তিন কাপ চা দে। ফ্রেশ পাত্তি দিবি।"

বলাই বলল, " জে আচ্ছা চেয়ারম্যান সাহেব।"

মোদাব্বের মুন্সী তখন কুদ্দুস আর গহর আলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর কী হলো মোসলেম মিয়ার?"

"কী আর হবে। ঠাঠা পড়লে শরীলের কী কিছু থাকে? এতো বড় জোয়ান মানুষ, পুরা শরীর পুইড়া কয়লা।"

মোসলেম মিয়া এই গ্রামেরই মানুষ, নানা রকম অসামাজিক কাজ নেশা ভাং এসব নিয়ে থাকতো। বাবার একমাত্র ছেলে, বাবার সব সহায়

সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে মোটামুটি ভাবে উচ্ছন্নে গিয়েছিল। গত রাত্রে হঠাৎ করে অসময়ের ঝড়ে বাজ পড়ে মারা গিয়েছে। গ্রামের এতোগুলো মানুষ, মৃত্যু এখানে এমন কিছু অপরিচিত বিষয় নয় তবে বাজ পড়ে মারা যাওয়ার ঘটনা খুব বেশি ঘটে নি। সারা গ্রামেই এখন সেটা নিয়ে মোটামুটি একটা উত্তেজনা রয়েছে।

মোদাব্বের মুন্সী মাথা নেড়ে বলল, "আমি কতোবার কইছি মোসলেম মিয়ারে এই নাফরমানী কাজ বন্ধ কর, হারামজাদা আমার কথা শুনল না। আল্লাহ্‌র গজব কারে কয় এখন বুঝলো কী না?"

গহর আলী মাথা নেড়ে বলল, "আল্লাহ্‌র মাইর চিন্তার বাইর।"

মোদাব্বের মুন্সী বলল, "তার বাপ ছিল ভদ্রলোক। ছেলেটা এইভাবে নষ্ট হল?"

কুদ্দুস বলল, "একদিক দিয়া ভালই হইছে মরছে। টাকাপয়সার খুব কষ্টে আছিল নাকি।"

গহর আলী বলল, "মনে আছে চেয়ারম্যান সাহেব, বাপের একমাত্র ছেলে কতো সহায় সম্পত্তি? বিয়া করল কাঞ্চনপুর গ্রামে?"

কুদ্দুস বলল, "বউটা মইরা বাঁচছে।"

মোদাব্বের মুন্সী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হায়াত মউত আল্লাহ্‌র হাতে। বউটার হায়াত নাই—"

গহর আলী বলল, "এর বউটা ভাল ছিল। বউটা বাইচা থাকলে মনে হয় মোসলেম মিয়ার এই অবস্থা হয় না। টাকা পয়সা এইভাবে নষ্ট করে না।"

কুদ্দুস বলল, "নষ্ট বলে নষ্ট। শেষের দিকে নাকী ভাত খাওয়ার পয়সা নাই। কী অবস্থা!"

মোদাব্বের মুন্সী হঠাৎ দুলে দুলে হাসতে শুরু করল। কুদ্দুস অবাক হয়ে বলল, "কী হলো চেয়ারম্যান সাহেব? হাসেন কেন?"

"মানুষের কপাল! এই মোসলেম মিয়ার টাকা পয়সার কতো দরকার, সেই টাকা পয়সার খনি আল্লাহ তারে দিলো কিন্তু ভোগ করার উপায় নাই!"

কুদ্দুস এবং গহর আলী কেউই ঠিক বুঝতে পারল না মোদাব্বের মুন্সী কী বলছে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে তারা মোদাব্বের মুন্সীর দিকে তাকাল। কুদ্দুস বলল, "কী বলছেন চেয়ারম্যান সাহেব? টাকা পয়সার খনি?"

মোদাব্বের মুন্সী মুখ গম্ভীর করে মাথা নাড়তে লাগলো, বলল, "খনি না তো কী? দুই চাইর লাখ টাকার কম না!"

কুদ্দুস সোজা হয়ে বসে বলল, "কী জিনিষ দুই চার লাখ টাকার কম না?"

মুকিদ আলীর একটা ঝিমুনীর মতো এসেছিল, দুই চার লাখ টাকার কথা শুনে মুহূর্তের মাঝে তার ঝিমুনী দূর হয়ে গেলো কিন্তু সেটা সে কাউকে বুঝতে দিলো না। চোখে মুখে ঘুমের ভান করে ঘাপটি মেরে মোদাব্বের মুন্সীর কথা শোনার চেষ্টা করতে লাগলো।

মোদাব্বের মুন্সী এদিক সেদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল "তোমরা জান না মানুষের শরীলে ঠাঠা পড়লে কী হয়?"

"কী হয় চেয়ারম্যান সাহেব?"

"ঠাঠা হইলো ইলেকট্রিসিটি। শরীলের ভিতর দিয়া যখন ইলেকট্রিসিটি যায় তখন চুল চামড়া গোশত পুইড়া কয়লা হইয়া যায়। কিন্তুক—"

"কিন্তুক কী?"

"শরীলের হাড্ডির মাঝে পরিবর্তন হয়। শরীলের হাড্ডি চুম্বুক হয়ে যায়।"

গহর আলী চোখ বড় বড় করে বলল, "চুম্বুক? চুম্বুক কী চেয়ারম্যান সাহেব?"

"চুম্বুক হইলো সোনা থেকে দামী। এমন এক জিনিস যেটা সবকিছু আকর্ষণ করে।"

মোদাব্বের আলী চুম্বক নামক বস্তুটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "আকর্ষণের" মতো একটা কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে পেরে বিশেষ প্রীত হলো। মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "এই মোসলেম মিয়া—তার টাকা পয়সার কতো অভাব। কিন্তু চিন্তা করো তার শরীলের মূল্য এখন লাখ টাকার কম না!"

কুদ্দুস এবং গহর আলীর চোখে এক ধরনের লোভ খেলা করে সেটা আবার দপ করে নিভে যায়। একটা মৃত মানুষের পুড়ে যাওয়া শরীরের মূল্য যতই হোক সেটা তারা তুলে আনতে পারবে না। বিক্রিও করতে পারবে না।

মুকিদ আলীর কথা ভিন্ন, তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে সেটা কাউকে বুঝতে দিলো না। মাথাটা পিছনে হেলান দিয়ে সে ঘুমের ভান করে বসে রইলো। কুদ্দুস কিংবা গহর আলীর সাহস না থাকতে পারে কিন্তু তার সাহসের অভাব নাই। মোসলেম মিয়ার মূল্যবান শরীর সে ঠিকই তুলে আনতে পারবে! শুধুমাত্র তার কবরটা খুঁজে বের করতে হবে। কোথায় দিয়েছে কবর? সে আবার কান খাড়া করে, কারণ শুনতে পেলো মোদাব্বের মুন্সী ঠিক সেই প্রশ্নটাই করেছে।

"কবর দিছে কোনখানে?"

কুদ্দুস বলল, "সরকারি গোরস্তানে।"

"সরকারি গোরস্তানে জায়গা কই?"

"একটা পুরান কবরের ভিতরে কবর দিছে। পশ্চিম দিকে একেবারে দেওয়ালের কাছে।"

"অ।" মোদাব্বের মুন্সী একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মোসলেম মিয়ার আত্মীয় স্বজন নাই। যদি থাকতো আমি কী বলতাম জান?"

"কী বলতেন চেয়ারম্যান সাহেব?"

"আমি বলতাম লাঠি সড়কি নিয়া কবর পাহাড়া দিতে। এই কবর এখন সোনার খনি।"

কুদ্দুস এবং গহর আলীর চোখ আবার চকচক করে ওঠে আবার দপ করে নিভে যায়।

বলাই ততক্ষণে টেবিলে চা দিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে মোদাব্বের মুন্সী তখন রাজনীতির আলাপ করে। আমেরিকা এবং চীন কেন এই দেশের দিকে নজর দিচ্ছে সেই ব্যাপারটি সে কুদ্দুস এবং গহর আলীকে বোঝানোর চেষ্টা করে। মুকিদ আলী সেগুলো বসে বসে শুনে কিন্তু কোনো কথাই তার মাথার ভেতরে ঢুকে না। সে চোখ বন্ধ করে স্পষ্ট দেখতে পায় সরকারি গোরস্তানের পশ্চিম পাশে মোসলেম মিয়ার কবর, যেটা খুড়ে সে লাখ টাকা দামের পোড়া একটা শরীর বের করে আনছে। তার এই কষ্টের জীবন হয়তো এভাবেই শেষ হবে খোদা হয়তো এটাই তার কপালে রেখেছেন!

মোদাব্বের মুন্সী কুদ্দুস আর গহর আলীকে নিয়ে না ওঠা পর্যন্ত মুকিদ আলী ঘুমের ভান করে বসে রইলো। তারা ওঠে যাবার পর সেও উঠে দাঁড়ায়। বলাই চোখ মটকে বলে, "কীরে মুইক্কা কই যাস?"

"বাড়ি যাই। শরীলের মাঝে জুত পাই না।"

"এতো সকালে বাড়ি গিয়া কী করবি? রাত গভীর না হলে কী চুরিতে বার হওয়া যায়?"

মুকিদ আলী ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠলো, সত্যিই সে আজ রাতটা গভীর হলেই চুরি করতে বের হবে কিন্তু বলাইয়ের সেইটা জানার কথা না। মুকিদ আলী জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আপনি যে কী কন বলাই কাকা!"

বাইরে ঘন কুয়াশা এবং কনকনে শীত। মুকিদ আলীর মনটা ভাল হয়ে গেলো কবর খুঁড়ে লাশ চুরির জন্যে এর চাইতে ভালো পরিবেশ আর কিছু হতে পারে না। সরকারি কবরস্থান গ্রামের বাইরে, আশেপাশে বসতি নাই। বসতি থাকলেও এই শীতে কেউ বের হবে না। যদি বেরও হয় এই ঘন কুয়াশায় কেউ তারে দেখবে না। মনে হয় খোদা তার জন্যেই এইরকম একটা অবস্থা করে দিয়েছেন!

ঘরে ফিরে এসে মুকিদ আলী চারটে ভাত ফুটিয়ে নেয়। দুপুরের বাসি তরকারী ছিল, সেটা দিয়েই সে তৃপ্তি করে খায়। মোসলেম মিয়ার শরীর তুলে আনার পর তার আর বাসি তরকারী দিয়ে ভাত খেতে হবে না। থালা বাসন ধুয়ে সে তার ঘরের বারান্দায় বসে একটা বিড়ি ধরালো, তার ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা—কোথাও চুরি করতে যাবার আগে সে সবসময় এই রকম উত্তেজনা টের পায়।

মুকিদ আলীর ঘড়ি নাই কিন্তু ঘড়ি ছাড়াই সে সময়ের আন্দাজ করতে পারে। ঠিক মাঝ রাতে সে একটা কোদাল আর একটা বস্তা নিয়ে বের হলো। অন্ধকার রাত, ঘন কুয়াশায় ঢাকা, গ্রামের নির্জন পথে একটা মানুষ নেই। মুকিদ আলী নিঃশব্দে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যায়, দীর্ঘদিনের অভ্যাস—হাঁটলে তার পায়ের কোন শব্দ হয় না।

সরকারি গোরস্তানের কাছাকাছি এসে সে খালের পাড়ে একটা ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ বসে রইলো। কেউ যদি আশে পাশে থেকে থাকে তাহলে তার চোখে পড়বে। যখন দেখলো কেউ নেই তখন সে সাবধানে দেওয়াল টপকে গোরস্তানের ভেতরে ঢুকলো। ভেতরে এক ধরনের সুনসান নীরবতা। গোরস্তানের ভেতর বড় বড় গাছ, নিচে গাছের শুকনো পাতা—অন্য যে কেউ হলে শুকনো পাতার শব্দ হতো কিন্তু মুকিদ আলী নিঃশব্দে হেঁটে গেলো।

কৃষ্ণপক্ষের রাত, মাঝরাতের দিকে চাঁদ ওঠার কথা, হয়তো এতোক্ষণে ওঠে গেছে। ঘন কুয়াশায় এই চাঁদের আলো অন্ধকার দূর করতে পারছে না, চারপাশে শুধু একটা ঘোলাটে অস্বচ্ছ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। মুকিদ আলী গোরস্তানের ভেতরে আবছা অন্ধকারে বাধানো কবরগুলো দেখতে পায়, সেগুলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ তার বুকের ভেতরে এক ধরণের কম্পন অনুভব করে, সে ছোটখাটো দুর্বল মানুষ, কিন্তু তার পরিচয় "মুইক্কা চোরা"—সে অনেক রাত বিরেতে অনেক বন জঙ্গল খাল বিল গোরস্তান শ্মশানে রাত কাটিয়েছে, কখনো ভয় পায় নি। আজ এই মধ্যরাতে গোরস্তানে এসে হঠাৎ করে তার বুকে প্রথমবার ভয়ের এক ধরনের কাঁপুনী খেলে গেলো।

মুকিদ আলী ভয়টাকে ঠেলে দূর করে দিয়ে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এই খানে কোনো এক জায়গায় মোসলেম মিয়াকে কবর দেওয়া হয়েছে। নূতন কবর, বের করা কোন সমস্যা হবে না। উপরে ঢিবির মতো করে মাটি উচু করে দেওয়া থাকবে। ঘাস পাতা ঝোপঝাড় থাকবে না। শেয়াল যেন না আসে সে জন্যে তুষ ছিটিয়ে দেওয়া থাকবে। মুকিদ আলী অন্ধকারের মাঝে হাতড়ে হাতড়ে দেখতে থাকে। ঠিক তখন সে প্রথমবার শব্দটা শুনতে পায়। খুব মৃদু একটা শব্দ। হুম হুম করে কেউ যেন শব্দ করছে।

মুকিদ আলীর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ করে যেন গলার কাছে এসে আটকে গেলো। তার একবার মনে হলো বুঝি সে চিৎকার করে ছুটে পালায়, কিন্তু সে পালালো না, শক্ত হয়ে বসে রইল। শব্দটা থেমে থেমে হয়—একটানা কিছুক্ষণ হবার পর আবার থেমে যায়।

"প্যাঁচা।" মুকিদ আলী বোঝালো, "নিশ্চয়ই হুতোম প্যাঁচা।"

মুকিদ আলী গ্রামের মানুষ, গ্রামের পশুপাখীর ডাক সে খুব ভাল করে চিনে। মুইক্কা চোরা হিসেবে রাত বিরেতে খাল বিলের পাশে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে বসে অনেক রাত জাগা পাখীর শব্দ শুনেছে, সে খুব ভাল করে জানে এটা প্যাঁচার ডাক না তবুও সে নিজেকে বোঝালো এটা আসলে একটা প্যাঁচার ডাক।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কবরগুলো হাতড়ে হাতড়ে মুকিদ আলী, মোসলেম মিয়ার কবরটা খুঁজে বের করলো। কাঁচা মাটির ঢিবি, উপরে তুষ ছড়ানো ঠিক সে যে রকম অনুমান করেছিল।

মুকিদ আলী গামছাটা কোমড়ে বেধে খুব সাবধানে কবরটা খুঁড়তে শুরু করে। কোদালের প্রথম কোপটা দেয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে হুম হুম শব্দটা থেমে গেলো। এতোক্ষণে এই হুম হুম শব্দে মুকিদ আলী কেমন যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো হঠাৎ করে শব্দটা থেমে যাওয়ায় সে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে। অস্বস্তির কারণটা সে জোর করে নিজের ভেতর থেকে সরিয়ে রাখে—তার কেমন জানি মনে হয় এই কবরের ভেতর থেকেই শব্দটা আসছে।

"কবরের ভিতরে মোসলেম মিয়ার পুড়ে কয়লা হওয়া শরীল" মুকিদ আলী ফিস ফিস করে নিজেকে বোঝালো "এই শরীলের প্রত্যেকটা হাড্ডি একটা করে চম্বুক। চম্বুক হচ্ছে সোনার থেকে দামী! মোদাব্বের মিয়ার নিজের মুখের কথা। আমি নিজের কানে শুনেছি। কোনোমতে শরীলটা তুলে বস্তা করে বাড়ি নিয়া যামু। বাড়ির পিছনে পুতে রাখমু। সময় হলে খোঁজ খবর নিয়া এই হাড্ডি বেঁচে আমি বড় লোক হয়ে যামু।" মুকিদ আলী একটা উত্তেজনা অনুভব করে। ফিস ফিস করে বলে, "আর চুরি চামারী না। এই মুইক্কা চোরা আর চুরি করবে না। এই হচ্ছে শেষ চুরি। এন্নের মতো শেষ।"

মুকিদ আলী নিঃশব্দে কবর খুঁড়তে থাকে। নরম মাটি সহজেই কোদালের কোপের সাথে উঠে আসে। আধাআধি হওয়ার পর হঠাৎ যেভাবে থেমে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবে হুম হুম শব্দটা ফিরে এলো, আগের চেয়ে আরো অনেক জোরে, অনেক স্পষ্টভাবে। শব্দটা লম্বা এবং দীর্ঘ সময়ের, হুমমম্ হুমমম্ করে কেঁপে কেঁপে উঠে। মুকিদ আলীর মনে হয় কোন মানুষ বুঝি জ্বরের ঘোরে কাতর শব্দ করছে। তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়,

কনকনে শীতের মাঝে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। হঠাৎ করে সে নিজের ভেতরে এক ধরনের আতংক অনুভব করে, এক ধরনের জান্তব ভয়ে তার শরীর শিউরে উঠে। এতোক্ষণ সে নিশ্চিত হতে পারে নি কিন্তু এখন সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই শব্দটি আসছে কবরের ভেতর থেকে।

মুকিদ আলী কোদালটি হাতে নিয়ে জোরে জোরে মাটিতে দুবার ঘা দিলো সাথে সাথে শব্দটা থেমে গেলো। ঠিক কী কারণ কে জানে শব্দটা থেমে যাওয়ায় মুকিদ আলীর আতংকটা কয়েকগুণ বেড়ে গেলো।

"এইসব কিছু না।" মুকিদ আলী নিজেকে বোঝালো, "মোসলেম মিয়ার পোড়া লাশ ভিতরে। এই লাশের হাড্ডি হচ্ছে সাত রাজার ধন। সোনার চেয়ে দামী। আমি এই লাশ না নিয়ে যামু না। কিছুতেই যামু না।"

মুকিদ আলী কোদাল হাতে নিয়ে আবার কোপাতে থাকে। শীতের রাতে তার শরীর ঘেমে যায়। চাদরটা খুলে সে কবরে নেমে মাটিগুলো উপরে তুলতে থাকে। দেখতে দেখতে গর্ত গভীর হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে কবরের উপরে ছাউনীর মতো করে দেয়া বাঁশগুলোর সন্ধান পায়।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, একটু আলো থাকলে খুব সুবিধে হতো। তার খুটের ভেতর ম্যাচ আছে সে একবার জ্বালাবে কী না বুঝতে পারছিলো না। বাঁশগুলো সরালেই সে কাফন দিয়ে মোড়ানো লাশটা পেয়ে যাবে। মুকিদ আলী উবু হয়ে বসে বাঁশগুলো তুলতে শুরু করে।

হঠাৎ হুমমম করে একটা বিকট শব্দ হলো—সাথে সাথে কবরের বাঁশ ভেঙ্গে সাদা কী একটা যেন ছিটকে বের হয়ে আসে। মুকিদ আলী আর্ত চিৎকার করে পিছিয়ে আসে, আবছা অন্ধকারে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না সাদা মতোন কিছু একটা দুলছে, দুলতে দুলতে সেটা হুমমমম করে একটা শব্দ করছে। শব্দের সাথে সাথে মাংশ পোড়া একটা দুর্গন্ধে পুরো জায়গাটা যেন ভরে গেলো।

মুকিদ আলী কাঁপা হাতে তার কোমরে গোঁজা ম্যাচটা বের করে ফস করে একটা কাঠি জ্বালালো। কাফনেমোড়া মোসলেম মিয়ার পোড়া শরীর, কাফন থেকে মাথাটা বের করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ম্যাচ কাঠির আলো থেকে আড়াল করার জন্যে মোসলেম মিয়া দুই হাত সামনে তুলে ধরল, পোড়া মাংশের আড়াল থেকে হাড় বের হয়ে আছে।

মুকিদ আলী কোদালটা হাতে নিয়ে পিছিয়ে আসে! প্রচন্ড আতংকে সে কিছু চিন্তা করতে পারছে না, সে শুধু জানে তাকে পালাতে হবে, যে ভাবেই হোক পালাতে হবে।

ঠিক তখন কুয়াশাটা কেটে চাঁদের আলোতে হঠাৎ করে পুরো এলাকাটা আলোকিত হয়ে উঠলো। মুকিদ আলী দেখলো গোরস্তানের দেওয়ালে পা

ঝুলিয়ে ছায়ামূর্ত্তির মতো কারা যেন বসে আছে। দীর্ঘ দেহ ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টি।

কোদালটা ফেলে দিয়ে সে উল্টোদিকে দৌড় দেবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো, তাকিয়ে দেখে সেদিকেও কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা একটা ছায়ামূর্ত্তি, মনে হয় মাথাটা বুঝি গাছের ডগা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ এবং ঘৃণা।

গোঙ্গানোর মতো একটা শব্দ করে মুকিদ আলী মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো, আর উঠলো না।

জীবনের শেষ চুরিটি সে আর সমাপ্ত করতে পারল না।

টেলিভিশন

যখন বিকেল বেলা রওনা দিয়েছি তখন একবারও সন্দেহ করি নি সন্ধ্যের পর এরকম অবস্থা হবে। শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত মোটামুটি গাড়ি চালিয়ে আনা গেছে, শ্রীমঙ্গলের পর হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন কুয়াশা এসে চারিদিক ঢেকে ফেলল। শীতকালে সন্ধ্যেবেলায় একটু আধটু কুয়াশা পড়তেই পারে, কিন্তু তাই বলে এরকম কুয়াশা? দেখে মনে হয় যেন সামনে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল, গাড়ির হেডলাইট সেই দেয়ালকে ভেদ করে যেতে পারে না—শুধু সেটাকে সামনে কয়েক ফুট ঠেলে সরিয়ে দেয়। কুয়াশায় সেই দেওয়ালকে ঠেলে সরিয়ে সরিয়ে গাড়ি চালানো নিশ্চয়ই খুব সহজ ব্যাপার না, ঘন্টাখানেক চালিয়ে আমার ড্রাইভার লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "অবস্থা জটিল স্যার।"

আমার ড্রাইভার কম কথার মানুষ। কোন পরিস্থিতিকেই তার কাছে জটিল মনে হয় না—শেষবার সে যখন বলেছিল অবস্থা জটিল—তখন কিছু ডাকাত রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে ডাকাতি করার চেষ্টা করেছিল। আমাদের করিৎকর্মা ড্রাইভারের নির্বুদ্ধিতার কাছাকাছি দুঃসাহসিকতা আর কপাল গুনে সেবার বেঁচে গিয়েছিলাম। কাজেই আজকে সে যখন আবার বলল, অবস্থা জটিল, তখন আমি নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কী করবে তাহলে? গাড়ি থামাবে?"

ড্রাইভার ঘনকুয়াশায় সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থেমে বলল, "না স্যার, গাড়ি থামানো যাবে না। জায়গাটা ভাল না।"

জায়গাটা কেন ভাল না আমি সেটা আর জিজ্ঞেস করলাম না, আমি জানি জিজ্ঞেস করলে সে কথার উত্তর দিবে না। রাস্তাঘাট বা গাড়ি চালানো এরকম কিছু বিষয়কে সে পুরোপুরি তার নিজস্ব বিষয় বলে বিবেচনা করে, আমার সাথে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। আমি বললাম, "সামনে কোন চা বাগানে ঢুকে গেলে কেমন হয়?"

ড্রাইভার আমার কথার কোন উত্তর দিল না, আমি আন্দাজ করেছিলাম সে উত্তর দিবে না। আমি প্রস্তাবটাকে আরেকটু জোরদার করার জন্যে বললাম, "চা বাগানে সব সময় একটা গেস্ট হাউস থাকে।"

ড্রাইভার এবারেও কোন উত্তর দিল না। আমার প্রস্তাবটি এখনো তার কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। আমি বললাম, "আমার পরিচিত একজন ম্যানেজার আছে—"

ড্রাইভার এবারে কথার উত্তর দিল। বলল, "কোন বাগানের ম্যানেজার, স্যার?"

"বাগানের নাম মনে হয় চাকলী ছড়া। এই আশে পাশে থাকার কথা।"

ড্রাইভার আমার কথার এবারেও কোন উত্তর দিল না, কাজেই তার হাতে পুরোপুরি নিজেকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া এখন আমার আর কিছু করার নেই। কুয়াশায় একটু পরে পরে গাড়ির উইন্ডশিল্ড ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তাই ওয়াইপার দিয়ে সেটা পরিষ্কার করতে হচ্ছে কিন্তু কাচ পরিষ্কার হচ্ছে কীনা বোঝার কিছু নেই—সামনে কুয়াশায় দুর্ভেদ্য সাদা দেওয়াল। মাঝে মাঝে একেবারে হঠাৎ করে সামনে থেকে আসা কোন গাড়ির হেড লাইট দেখা যায়—কিন্তু সেটা দেখা যায় একেবারে কাছে চলে আসার পর, দূর থেকে দেখা যাবার কোন উপায় নেই। ভাগ্যিস কুয়াশার ভয়ে সবাই গাড়ি চালাচ্ছে একেবারে শামুকের গতিতে তা না হলে যে কী অবস্থা হতো কে জানে। প্রত্যেকবার সরু রাস্তায় একটা ট্রাক বা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাই আর আমি বুক থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিই। এই ভয়ংকর রাস্তা কখন শেষ হবে কখন ঢাকা পৌছাব কে জানে।

এভাবে আরো কতক্ষণ গিয়েছে কে জানে, হঠাৎ ড্রাইভার ব্রেক করে গাড়িটা থামালো। আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, "কী হয়েছে"

"বাগান।"

"বাগান?"

"জে। চাকলী ছড়া বাগান।"

এই ঘোর কুয়াশার মাঝে সে চাকলী ছড়া চা বাগান কেমন করে খুঁজে পেল কে জানে। আমি ডানে বামে তাকিয়ে ঘন কুয়াশায় দেওয়াল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় বাগান?"

"ঐদিকে। বাম দিকে।"

আমি বাম দিকে তাকালাম এবং মনে হলো ঘন কুয়াশার মাঝে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে কুয়াশার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণের মাঝে তার উত্তপ্ত গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে কম কথার মানুষ এবং যে দুই একটি কথা বলে সেটি ঠাণ্ডা গলায় বলতে পারে না। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে আমিও গাড়ি থেকে নেমে টিমটিমে আলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। ছোট একটা চালাঘরের মাটির মেঝেতে কাঠকুটো দিয়ে একটা আগুন জ্বালিয়ে একজন হালকা পাতলা মানুষ চাদর মুড়ি দিয়ে হাত পা গরম করছে। আমার ড্রাইভার আবার গর্জন করে বলল, "গেট খুলো তাড়াতাড়ি।"

চাদর মুড়ি মানুষটা বলল, "আপনারা কেডা? কী চান?"

ড্রাইভার আবার হুংকার দিয়ে বলল, "সেইটা দিয়ে তোমার কী হবে? গেট খুলতে বলছি গেট খুলো।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। ম্যানেজার সাহেব আমার পরিচিত, তার সাথে দেখা করতে যাব।"

মানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের আলোতে আমাকে যাচাই করে দেখল, মনে হলো তার পরীক্ষায় আমি পাশ করে গেলাম। ইউনিভার্সিটির মাস্টারদের চেহারায় একধরনের গোবেচারা গোবেচারা ভাব থাকে, কেউ খুব একটা সন্দেহ করে না। সে তার কোমরে সুতায় বাঁধা একটা চাবি হাতে নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। গেটটা অবশ্যি খুব সরল, একটা বাঁশ আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখেছে, সেটাই শেকল দিয়ে বাঁধা। বাঁশের উপরে এবং নিচে দিয়ে যে কোন প্রাণী চলে যেতে পারবে সেটা নিয়ে কারো কোন দুশ্চিন্তা নেই। এই গেটের উদ্দেশ্য গাড়িকে আটকানো।

বাঁশটা তুলে দেবার পর ড্রাইভার গাড়িতে বসে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, "ম্যানেজার সাহেবের বাসা কোথায়?" দারোয়ান গেট খোলা এবং বন্ধ করার বাইরে কোন দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নয়, সে অনিশ্চিত একটা ভঙ্গী করে বলল, "ঐ যে হেই দিকে।"

কথাটি দিয়ে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, ড্রাইভারও কিছু বুঝল বলে মনে হলো না, কিন্তু সে তার সাথে কথা বলে আর সময় নষ্ট করল না, চা বাগানের ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে ফেলল। একটু আগে রাস্তাটি অন্তত পাকা রাস্তা ছিল, এখন রাস্তাটি কাঁচা, ঘন কুয়াশায় সেটি কোথা থেকে শুরু হয়েছে, কোথায় শেষ হয়েছে এবং কোনদিকে যাচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি ভয়ে ভয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকালাম, সে মুখের মাংশপেশী শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেখেছে। উচু নিচু খানা খন্দ ভেঙ্গে সে ঘন কুয়াশা ভেদ করে যে পথ দিয়ে যাচ্ছে সেটা যে একটি রাস্তা আমার পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব না। কতোক্ষণ এভাবে গিয়েছি জানি না, এক সময় ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে বলল, "এসে গেছি।"

আমি আশে পাশে ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না, কিন্তু ড্রাইভার যখন বলেছে এসে গেছি তখন নিশ্চয়ই এসে গেছি। আমি গাড়ি থেকে নামলাম, সত্যি সত্যি মনে হলো দুই পাশে আবছা জমাট বাধা অন্ধকার, এগুলো নিশ্চয়ই বাড়িঘর। চা বাগানের ম্যানেজার বা স্টাফদের বাসা এখানে থাকার কথা। কোথায় গিয়ে কীভাবে খোঁজ নেব বিষয়টি নিয়ে যখন একটু অস্বস্তি বোধ করছি ঠিক তখন মনে হলো অন্ধকার ফুড়ে হঠাৎ একজন মানুষ আমার সামনে হাজির হলো। আমি চমকে উঠেছিলাম, কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ম্যানেজার সাহেবের বাসা কোনটা?"

"এইতো এইটা।" বলে মানুষটা হাত তুলে কিছু একটা দেখিয়ে দিল, আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখি সত্যি সত্যি বড় বড় গাছে ঢাকা একটা বাসা, কুয়াশার জন্যে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

"গেইটটা কোথায়?"

"এইযে এইখানে—" মানুষটা হাত তুলে সামনে দেখালো। আমি একটু এগিয়ে দেখি সত্যি সত্যি একটা গেট। গেট খুলে নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে আমি এগিয়ে যেতে থাকি—বেশ কিছুক্ষণ থেকে আমি ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এখন অস্বস্তিটা হঠাৎ করে বেড়ে গেলো। আমি ড্রাইভারের কাছে বেশ জোর গলায় দাবী করেছি এই বাগানের ম্যানেজারের সাথে আমার পরিচয় আছে—কথাটা আসলে পুরোপুরি সত্যি নয়। একদিন ট্রেনে করে আসার সময় ম্যানেজার সাহেব পাশের সীটে বসেছিলেন, ট্রেনে পাশাপাশি বসলে যেরকমটি কথা হয় তার সাথে সেরকম কথা হয়েছে এবং ট্রেন থেকে নামার সময় আমাকে বলেছিলেন, "একদিন বাগানে বেড়াতে আসবেন।" আমিও বলেছিলাম, "আসব, নিশ্চয়ই আসব।" ভদ্রলোকও ভদ্রতা করে বলেছিলেন আমিও ভদ্রতা করে উত্তর দিয়েছিলাম। এখন সত্যি সত্যি বিনা আমন্ত্রণে রাত কাটাতে চলে এসেছি—বিষয়টা রীতিমতো লজ্জাজনক। ম্যানেজার ভদ্রলোক যদি আমাকে চিনতে না পারেন, তখন কী হবে?

আমি লাজ লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দরজায় টোকা দিলাম, কয়েকবার শব্দ করার পর কালো এবং শুকনো মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ দরজা খুলে দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। আমি কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম, "ম্যানেজার সাহেব বাসায় আছেন?"

"জে। আছে।" মানুষটা আমাকে একটু খুটিয়ে দেখে বলল, "বসেন। সাহেবরে খবর দিই।"

ভেতরে দামী সোফা। শোকেসে নানাধরনের জিনিষপত্রে বোঝাই। দেওয়ালে কিছু বাধানো ছবি। ঘরে টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছে। এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে কিন্তু ভোল্টেজ কম—আলোগুলি অনুজ্জ্বল এবং মন খারাপ করা। আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে সোফায় বসে আছি, ম্যানেজার সাহেব আসার পর তিনি যদি আমাকে না চেনেন তাহলে কীভাবে কথা বলব?

আমি যখন এই ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি ঠিক তখন ভেতর থেকে একজন লোক বের হয়ে এলো, এই শীতের মাঝে তার পরনে হাফ প্যান্ট আর টী সার্ট। আমাকে দেখে চোখ বড় বড় করে বলল, "আরে আপনি?"

আমি লোকটাকে এবারে চিনতে পারলাম, এই চা বাগানের ম্যানেজার। ট্রেনে তিনি যখন আমার পাশে বসেছিলেন তখন রীতিমতো স্যুট টাই

পরেছিলেন এখন হাফ প্যান্ট পরে আছেন বলে চিনতে পারছি না। চা বাগানের ম্যানেজাররা যে হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতে পারেন আমি সেটা কখনো কল্পনাও করি নি! ম্যানেজার সাহেব এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে জোরে জোরে ঝাকাতে ঝাকাতে বললেন, "আপনি যদি আর একদিন আগে আসতেন কী চমৎকার হতো!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"আমার স্ত্রীর সাথে দেখা হতো। আজ দুপুরেই ঢাকা গেছে।"

ট্রেনে পাশাপাশি বসে আসার সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম চা বাগানের ম্যানেজাররা খানিকটা নিঃসঙ্গ হন। তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর ভাল স্কুলে যাবার জন্যে ঢাকা চলে যায়, সাথে মায়েরাও থাকে, নিঃসঙ্গ বাবা একা একা চা বাগানে ঘুরে বেড়ান। ম্যানেজার সাহেব মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আমার স্ত্রী থাকলে খুব খুশি হতো—এই সেদিনও তার সাথে আপনার কথা বলছিলাম!"

এই ভদ্রলোক তার স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্কে কী কথা বলছিলেন আমি আর সেটা নিয়ে কৌতূহল দেখালাম না। ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পেরেছেন তাতেই আমি খুশি। বুকের মাঝে আটকে থাকা চাপা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বললাম, "আমিও ঢাকা যাচ্ছিলাম। পথে যা কুয়াশা পড়েছে সেটা আর বলার মতো নয়। ড্রাইভার আর এগুতে সাহস করছে না ভাবলাম এখানে রাত কাটিয়ে যাই।"

ম্যানেজার সাহেব হাসার ভঙ্গী করে বললেন, "কুয়াশাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তার কারণে অন্তত আমাদের বাগানে আপনার পায়ের ধূলো পড়ল!"

আমি বললাম, "আমার পায়ের ধূলো এতো মূল্যবান জানলে তো আমি অনেক আগেই খামে ভরে এক প্যাকেট পাঠিয়ে দিতে পারতাম।"

আমার এই মোটা রসিকতাতেই ম্যানেজার সাহেব হা হা করে হাসতে লাগলেন, হাসতে হাসতে বললেন, "আমার স্ত্রী থাকলে খুব খুশি হতো! সে খুব মানুষ পছন্দ করে। আপনাদের মতো মানুষ হলে তো কথাই নেই!"

আমাদের মতো মানুষ বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছেন আমি সেটা নিয়েও কৌতূহল দেখালাম না। ম্যানেজার সাহেব হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি এতো লম্বা জার্নী করে এসেছেন নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড।"

আমি বললাম, "না, না—আমি মোটেও টায়ার্ড নই। ঢাকা পর্যন্ত যাবার কথা ছিল—অর্ধেক রাস্তাও যাই নি। টায়ার্ড হবার সময় পাই নি।"

"টায়ার্ড না হলে ভাল কিন্তু আগে আপনাকে হাত পা ছেড়ে একটু রিলাক্স করার ব্যবস্থা করে দিই। আমার স্ত্রী থাকলে আপনাকে কিছুতেই গেস্ট হাউজে থাকতে দিতো না—এই বাসাতেই রাখতো। কিন্তু আমি সেই

রিস্ক নেবো না। আপনাকে গেস্ট হাউজেই ব্যবস্থা করে দিই, সেখানে সাপোর্ট স্টাফ ভাল।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "হঠাৎ করে চলে এসে আপনাকে কী ঝামেলার মাঝে ফেলে দিলাম!"

ম্যানেজার সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "ছিঃ ছিঃ—আপনি ঝামেলার কথা কী বলছেন! আমার কতো বড় সৌভাগ্য আপনি এসেছেন। আর আমাদের চা-বাগানে গেস্ট হাউজ সবসময় রেডী থাকে—কখন কে চলে আসে তার ঠিক নেই। আসেন যাই—"

ম্যানেজার সাহেব উঠে একটা হাঁক দিতেই কয়েকজন মানুষ ছুটে এলো, তিনি তাদের একজনকে পাঠালেন গেস্ট হাউজ খুলে দিতে, একজনকে পাঠালেন বার্বুচিকে ডেকে আনতে এবং একজনকে পাঠালেন গাড়ি থেকে আমার ব্যাগ নামিয়ে আনতে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে চা-বাগানের ম্যানেজাররা মোটামুটি জমিদারদের মতো থাকেন।

গেস্ট হাউজে বেশ কয়েকটি ঘর, আমার জন্যে এক কোনার একটা ঘর খুলে দেয়া হলো, কথা শুনে বুঝতে পারলাম এটা সবচেয়ে ভাল ঘর। ভেতরে ঢুকে আমার নিজেরও সন্দেহ থাকল না, মোজাইক করা মেঝে, টাইল করা বাথরুম, বড় বড় কাঁচের জানালা, দেয়ালে এয়ারকুলার। বড় বিছানা—আমার সামনেই হই চই করে বিছানার চাদর, কম্বল পাল্টে মশারী টানিয়ে দেয়া শুরু হলো।

ম্যানেজার সাহেব এদিক সেদিক দেখে অপ্রয়োজনে দুই চারটি ধমক দিয়ে দিলেন এবং তখন চারিদিকে অনেক মানুষজন ছোটাছুটি শুরু করে দিল। ম্যানেজার সাহেব এই ফাঁকে আমাকে গেস্ট হাউজটা ঘুরিয়ে দেখালেন। সেই ব্রিটিশ আমলে বাংলো ধাচে তৈরি, ইটের গাথুনির উপর টিনের ছাদ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনেকবার ভেতরে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন বাইরে থেকে এটাকে পুরানো একটা বাংলো মনে হলেও ভেতরে একেবারে আধুনিক আয়োজন। এয়ার কুলার, গরম পানি, ফ্রীজ এমন কী মাঝখানের হল ঘরে একটা টেলিভিশন পর্যন্ত রয়েছে! আমি টেলিভিশনটি দেখে বললাম, "চা বাগানের এই নিরিবিলিতে টেলিভিশনটা কেন জানি মানায় না।"

ম্যানেজার সাহেব আমার দিকে তাকালেন, কিছু বললেন না। টেলিভিশনের পাশে রিমোট কন্ট্রোলটি রাখা, অনেকটা অভ্যাসের বশেই আমি সেটা হাতে নিয়ে টিপে দিয়েছি, সাথে সাথে ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ করে টেলিভিশনটি চালু হয়ে গেলো। রিসেপশান খুব খারাপ ঝিরঝিরে স্ক্রীনের ভেতর বাংলা নাটকের আঠা আঠা ভালবাসার একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। নায়ক কিংবা নায়িকা কারো চেহারাই স্পষ্ট নয় ভাসা ভাসা ভাবে তাদের

আবেগ আপ্লুত গলা শোনা গেলো। আমি চ্যানেল পাল্টানোর চেষ্টা করতে করতে বললাম, "কিছুই তো দেখা যায় না।"

"না।" ম্যানেজার বললেন, পাহাড়ের আড়ালে সে জন্যে সিগনাল পাওয়া যায় না।"

আমি বললাম, "উচুতে একটা এন্টেনা ঝোলালে মনে হয় ভাল রিসেপশন হবে।"

ম্যানেজার সাহেব হাত নেড়ে অস্পষ্ট গলায় কিছু একটা বললেন তারপর এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "বাগানের মালিকের জন্যে রাখতে হয়—তার টেলিভিশন রোগ আছে।"

"কিন্তু কিছু যদি দেখা না যায় তাহলে টেলিভিশন রেখে লাভ কী"

"লাভ নেই। কিন্তু অনেকের কাছে টিলিভিশনটা একটা থেরাপির মতো। কাছাকাছি আছে জানলে তাদের এক ধরনের আরাম হয়। না থাকলে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে!"

আমি শব্দ করে হাসলাম, ব্যাপারটা সত্যি হতেও পারে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা গেস্ট হাউজের বারান্দায় বসেছি। কুয়াশা একটু কমেছে বলে মনে হলো, আশেপাশে উচু টিলা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ আছে কী না দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চারিদিকে একটা নরম আলো। পুরো এলাকাটাতে এক ধরনের অপার্থিব সৌন্দর্য্য। গেস্ট হাউজের বয় এসে আমাদের চা দিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে বললাম, "জায়গাটা কী সুন্দর!"

ম্যানেজার সাহেব হাসলেন, বললেন, "বাইরে থেকে যারাই আসে তারাই এই কথা বলে। কিন্তু কয়েকদিন একসাথে থাকতে হলেই তারা হাঁপিয়ে ওঠে। চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে যায়।"

আমি বললাম, "সৌন্দর্য্য জিনিষটা মনে হয় অল্প অল্প করে দেখার জিনিষ। মাঝে মাঝে দেখলে ভাল লাগে। একটানা বেশি দেখলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।"

ম্যানেজার সাহেব কিছু বললেন না, আমি বললাম, "আপনার কেমন লাগে?

"আমার?"

"হ্যাঁ।"

"আমি দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা থাকি—এখানে সৌন্দর্য্য আছে না অসৌন্দর্য্য আছে সেটাই কখনো খেয়াল করে দেখি না।"

ঠিক এরকম সময় দূর থেকে ঢং ঢং করে দশটা বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। অনেক দিন পর হাতে বাজানো ঘণ্টার শব্দ শুনছি, বিষয়টি এখনো

আছে সেটাই জানতাম না! বললাম, "ভারী মজা তো। হাত দিয়ে পিটিয়ে সময় জানিয়ে দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ। সেই বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছে।"

আমি বললাম, "মাত্র দশটা বাজে, মনে হচ্ছে নিশুতি রাত।"

ম্যানেজার সাহেব বললেন, "চা বাগানে রাত দশটা হচ্ছে নিশুতি রাত।"

আমি বললাম, "আপনার টেলিভিশন ঠিক থাকলে এখন খবর শোনা যেতো।"

ম্যানেজার সাহেব কিছু বললেন না। আমি একটু পরে বললাম, "মনে হচ্ছে পৃথিবীর একেবারে বাইরে চলে এসেছি।"

"উহুঁ! পুরোপুরি মনে হচ্ছে না। তাহলে পৃথিবীর খবর শোনার জন্যে আপনি এতো ব্যস্ত হতেন না।"

আমি হাসলাম, বললাম, "এটা অভ্যাস। খবর না শুনলে পত্রিকা না পড়লে কেমন জানি অস্বস্তি হতে থাকে।"

ম্যানেজার বললেন, "এন্টেনা নাড়া চাড়া করে আপনাকে খবরটা শুনিয়ে দিতে পারি। আমাদের এটেনডেন্ট এ ব্যাপারে মহা ওস্তাদ।"

"থাক!" আমি বললাম, "দরকার নেই। এক রাত খবর না শুনলে এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।"

"থ্যাংক ইউ।" ম্যানেজার সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি টেলিভিশন একেবারে পছন্দ করি না।"

আমি হেসে বললাম, "এটা পছন্দ করার বিষয় নয়। এখনো কাউকে দেখি নি যে টেলিভিশন পছন্দ করে!"

ম্যানেজার সাহেব বললেন, "আমার অপছন্দ একটু অন্যরকম।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কী রকম?"

"টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নয়—টেলিভিশন জিনিসটাই আমি দেখতে পারি না। সহ্য করতে পারি না। আমার আমার—"

ম্যানেজার কথা থামিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কী?"

"আসলে টেলিভিশন নিয়ে আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেই থেকে আমি আর এটা সহ্য করতে পারি না।"

"কী ঘটেছিল?"

"আমি সাধারণত এটা কাউকে বলি না, বললে বিশ্বাসও করবে না। আপনাকে বলি। বিশ্বাস না করতে চাইলে করবেন না।"

"বিশ্বাস করব না কেন?"

ম্যানেজার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

কাছাকাছি কোন গাছে একটা রাত জাগা পাখী পাখা ঝাপটিয়ে শব্দ করে কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে গেস্ট হাউজের উপর দিয়ে উড়ে গেলো। বহু দূর থেকে কোন একটা বুনো পশুর ডাক শুনতে পেলাম। চারিদিকে সুনসান নীরব, তার মাঝে ম্যানেজার সাহেব তার গল্প শুরু করলেন। গল্পটা এরকম :

আমার যখন বিয়ে হয় আমি তখনো বুঝতে পারি নি যে আমার স্ত্রী নীলা, অন্য দশটা মেয়ে থেকে অন্য রকম। কখনো গান গাইতে শিখে নি কিন্তু খুব সুন্দর গানের গলা। ছবি আঁকতে শিখে নি কিন্তু রঙিন কাগজ কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে চমৎকার ডিজাইন করে ফেলতে পারতো। আমার জন্মদিনে একটা পাঞ্জাবী উপহার দিল নিজ হাতে সেখানে বাটিকের কাজ করেছে, এতো সুন্দর যে যেই দেখে সেই অবাক হয়ে যায়। বই পড়ার খুব সখ—আমি মোটামুটি চাছাছোলা মানুষ তার আগ্রহেই আমারও আস্তে আস্তে বই পড়ার অভ্যাস হলো। মানুষটাও খুব ভাল, হাসি খুশি চঞ্চল টাইপের। মাঝে মাঝেই আমার মনে হতো আমার মত মানুষের এতো ভাল বউ পাওয়ার কথা না!

আমার স্ত্রী নীলার আগ্রহ কিংবা অনাগ্রহের কারণে আমরা কোনদিন টেলিভিশন কিনি নি। সে টেলিভিশন পছন্দ করতো না, বলতো যে যন্ত্র আমার যেটা দেখার দরকার সেটা দেখিয়ে দেবে, যেটা শোনার দরকার সেটা শুনিয়ে দেবে যেটা বোঝার দরকার সেটা বুঝিয়ে দেবে সেরকম যন্ত্রের আমার দরকার নেই। আমার যখন দেখার দরকার তখন দেখব যখন শোনার দরকার তখন শুনবো যখন বোঝার দরকার তখন বুঝব। যুক্তিটা ভাল না খারাপ আমি জানি না কিন্তু নীলাকে আমি এতো ভালবাসি যে সে যেটা বলে সেটাই আমার সবকিছু। তাই আমার বাসায় শেলফ ভরা বই, তাক ভরা লং প্লেয়িং রেকর্ড, দেয়াল ভরা পেইন্টিং কিন্তু কোন টেলিভিশন নেই। টেলিভিশন না দেখে দেখে আমারও কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেলো। মাঝে মাঝে যখন কারো বাসায় বেড়াতে যাই, তারা যখন টেলিভিশন চালু করে রাখে আমার তখন কেমন যেন হাঁস ফাস লাগতে থাকে।

আমি তখন একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীতে চাকরী করি। এর মাঝে হেড অফিস থেকে চিঠি এসেছে আমাকে ছয় সপ্তাহের জন্যে আমেরিকা যেতে হবে। আমি নীলাকে বললাম, "তুমিও চল।"

নীলা বলল, "তোমার কোম্পানী আমাকে নেবে কেন?"

আমি বললাম, "আমার কোম্পানী নেবে আমাকে, আমি নেব তোমাকে!"

"আর এই বাসা? এটা কে দেখবে।"

"তালা মেরে চলে যাব।"

নীলা হেসে বলল, "তাহলে যখন ফিরে আসবে তখন দেখবে তোমার বাসা ধূ ধূ খালি। নীলক্ষেতে পুরানো বইয়ের দোকান থেকে আমার সব বইগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে কিনতে হবে।"

আমি বললাম, "তুমি চিন্তা করো না, আমি একজনকে খুঁজে বের করব যে তোমার বাসা ছয় সপ্তাহ পাহারা দেবে।"

"আগে খুঁজে বের করো তারপর দেখা যাবে।"

কাজটা যতো সহজ হবে ভেবেছিলাম সেরকম সহজ হলো না। একই সাথে বিশ্বাসী এবং ছয় সপ্তাহের জন্যে কাজকর্ম নেই এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। শেষ পর্যন্ত মনে হলো দারোয়ান বা কেয়ার টেকার ধরনের একজন মানুষকে রেখে যেতে হবে তখন হঠাৎ করে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন নীলার বাবা! নীলার মা মারা গেছেন বেশ অনেক দিন হলো, এখন একা মানুষ দেশের বাড়িতে থাকেন। তিনি আমাদের বাসায় ছয় সপ্তাহ থাকতে রাজী হলেন, তবে একটা শর্ত সাপেক্ষে। টেলিভিশনে তখন খুব জম জমাট একটা সিরিয়াল হচ্ছে সেটা দেখার জন্যে প্রতি বুধবার তাকে বাড়ি যেতে হবে। আমরা বললাম, তার কোন প্রয়োজন নেই ছয় সপ্তাহের জন্যে তিনি তার টেলিভিশনটাই এখানে নিয়ে আসতে পারবেন। নীলা যেখানে টেলিভিশন দেখতে পারে না সেখানে তার বাবা এরকম টেলিভিশন ভক্ত কেমন করে হলো কে জানে?

নীলার বাবাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমরা প্লেনে করে সোজা নিউ ইয়র্ক। আমি সারাদিন অফিসে কাজ করি নীলা নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে আর বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যেবেলা কোন ছোট রেস্টুরেন্টে খাই, কোন কোনদিন নিজেরা কিছু রান্না করি। উইক এন্ডে ছুটি তখন আরো দূরে কোথাও যাই, সব মিলিয়ে খুব চমৎকার ছয় সপ্তাহ কাটিয়ে দেশে ফিরে এলাম। রওনা দেবার আগে টেলিফোনে নীলার বাবার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম লাভ হয় নি। দেশে লাইন পাওয়া খুব কঠিন, পাওয়া গেলেও কানেকশান এতো দুর্বল যে কথা বলা যায় না। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা বাসায় এসেছি। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ভেতরে টেলিভিশন চলছে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু যতই বেল বাজাই কেউ দরজা খুলে না। শেষে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে আমরা আতংকে চিৎকার করে উঠলাম। টেলিভিশনের সামনে নীলার বাবা মৃত পড়ে আছেন, টেলিভিশনে একটা হাসির নাটক হচ্ছে। নাটকের চরিত্রগুলো একটু পরে পরে হেসে উঠছে, দেখে মনে হয় মৃতদেহটি দেখে হাসছে। কী ভয়ানক একটা দৃশ্য!

নীলার বাবা কতোদিন আগে মারা গেছেন কে জানে—আমি সেই দৃশ্যের বর্ণনা দিতে চাই না। নীলাকে সরিয়ে নিয়ে কোনভাবে লোকজনকে খবর দিলাম। পুলিশ এলো, ডাক্তার এলো, আত্মীয়স্বজন এলো। ঘর ভেতর

থেকে বন্ধ ছিল, সম্ভবত হার্ট এটাকে মারা গেছেন। জানাজা পরিয়ে দাফন করিয়ে ঘর দোর পরিষ্কার করে আমরা যখন আবার আমাদের জীবন শুরু করার চেষ্টা করছি তখন প্রায় সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে।

নীলার সাথে তার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক ছিল। মা মারা যাবার পর সেটি আরো গভীর হয়েছিল। হঠাৎ করে বাবার এরকম অস্বাভাবিক একটা মৃত্যু নীলাকে খুব বড় একটা ধাক্কা দিল। সে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলো। আমি বাসায় এসে আবিষ্কার করতাম সোফায় পা তুলে চুপচাপ গুটিশুটি মেরে বসে আছে। প্রায় সময়েই আবিষ্কার করতাম সে টেলিভিশনটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

একদিন আমি নীলাকে জিজ্ঞেস করলাম, "টেলিভিশনটা কী করব বলো দেখি?"

"বিক্রি করে দাও।"

"বিক্রি করে দেবো?"

"হ্যাঁ।"

"পুরানো টিভি—কয় টাকায় আর বিক্রি হবে।"

"তাহলে কাউকে দিয়ে দাও।"

'কাউকে দিয়ে দেবো?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে।"

আমি তাই টেলিভিশনটা কাকে দেয়া যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি। আজকাল গ্রামে ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে, গ্রামে গরীব আত্মীয় স্বজন আছে তাদের কাউকে দিয়ে দিলেই হবে। গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে আত্মীয় স্বজন আসে—পরের বার তাদের কেউ এলে এটা ধরিয়ে দেয়া যাবে। কেমন করে নেবে সেটা তাদের দায়িত্ব।

এর মাঝে একদিন একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। গভীর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে তাকিয়ে দেখি পাশে নীলা নেই। আমি বিছানায় উঠে বসেছি তখন মনে হলো পাশের ঘর থেকে মানুষের কথার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আমি অবাক হয়ে বিছানা থেকে নেমে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি টেলিভিশন চলছে এবং তার সামনে সোফায় শুয়ে নীলা ঘুমুচ্ছে। আমি নীলাকে ডেকে বললাম, "নীলা।"

নীলা চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, "কী?"

"তুমি এখানে কী করছ?"

"ঘুম আসছিল না তো—তাই এখানে শুয়েছি।"

"আমাকে ডাকলে না কেন?"

নীলা কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

আমি বললাম, "শুতে চল।"

নীলা স্বাভাবিক গলায় বলল, "চল।"

আমি টেলিভিশনটা বন্ধ করে নীলাকে শোয়ার ঘরে নিয়ে এলাম।

এরপর থেকে আমি মাঝে মাঝেই দেখি নীলা টেলিভিশন অন করে বসে আছে। টেলিভিশন দেখাটা এমন কিছু বড় অপরাধ নয়, তার মানসিক এই অবস্থায় সে যদি টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠান দেখে ভুলে থাকতে চায় সেটা একদিক দিয়ে ভালই। কিন্তু আমি একটা বিচিত্র জিনিষ আবিষ্কার করলাম। সে টেলিভিশন অন করে তাকিয়ে থাকে কিন্তু সেখানে কী হচ্ছে সে তার কিছু লক্ষ্য করে না। সে টেলিভিশনটা দেখে, তার অনুষ্ঠানকে দেখে না। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তো আগে টেলিভিশন দেখতে না। এখন দেখো?"

নীলা দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "মাঝে মাঝে দেখি।"

"কোন অনুষ্ঠান তোমার প্রিয়?"

"অনুষ্ঠান?" নীলা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, মনে হলো আমার কথাটা বুঝতে পারছে না।

"হ্যাঁ। কোন অনুষ্ঠান?"

নীলা আমতা আমতা করে বলল, "না, মানে ইয়ে—" সে তার কথা শেষ করল না।

এরকম সময় আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাই শহরে এসেছে, মোটামুটি অপদার্থ পরিবারের ছেলে, যখনই টাকার দরকার হয় কোন ছল ছুতোয় শহরে হাজির হয়। আমার মনে হলো টেলিভিশনটা দূর করার এই সুযোগ। নীলাকে কথাটা বলতেই সে কেমন যেন চমকে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, "না, না, প্লিজ এখন দিও না।"

"কেন? তুমি তো আগে কখনো টেলিভিশন দেখতে না।"

নীলা মাথা নেড়ে বলল, "আমি এখনও দেখি না। কিন্তু মানে ইয়ে—"

"কী?"

নীলা একটু ছটফট করে বলল, "মানে এটা তো বাবার একটা স্মৃতি। সেজন্যে ভাবছিলাম—"

"কী ভাবছিলে?"

"আরও কয়দিন যাক? তারপর দেবো।" আমার দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "প্লীজ!"

কাজেই টেলিভিশনটা বাসাতে থেকে গেলো।

আমাদের বাসার পরিবেশটা কিন্তু অনেক পাল্টে গেছে। নীলা কথা বলে খুব কম। সেরকম বইও পড়ে না, গানও শুনে না। আমার ধারণা আমি যখন থাকি না তখন সে সারাক্ষণ টেলিভিশন চালিয়ে তার সামনে বসে থাকে। মাঝে মাঝেই গভীর রাতে আমি আবিষ্কার করি সে বিছানা থেকে উঠে টেলিভিশনের সামনে বসে আছে। আগে সোফায় বসে থাকতো—এখন সে বসে টেলিভিশনের খুব কাছে। শুধু তাই নয় চ্যানেলগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে এমন একটা চ্যানেল বের করে যেখানে কোন অনুষ্ঠান নেই। তারপর সেই শূন্য স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে কী দেখে আমি বুঝতে পারি না—কারণ আমি যখন তাকে এভাবে আবিষ্কার করি তখন সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে! মনে হয় সে সত্যিই কিছু দেখছে।

আমি একদিন গভীর রাতে তাকে আবিষ্কার করলাম টেলিভিশন স্ক্রীনের সাথে প্রায় মুখ লাগিয়ে সে দেখছে। আমি আস্তে আস্তে নীলার পিঠে হাত রেখে ডাকলাম, "নীলা।"

সে চমকে আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো অপ্রকৃতস্থ মানুষের মতো। আমি বললাম, "কী হয়েছে নীলা?"

"কিছু হয় নাই?"

"কী দেখছ টেলিভিশনে?"

নীলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কী দেখছ?"

"বাবাকে।"

আমি অবাক হয়ে বলাম, "বাবা! কোথায়?"

নীলা টেলিভিশনটি দেখিয়ে বলল, "এইতো এখানে।"

"কোথায়?"

নীলা কিছুক্ষণ টেলিভিশনটির দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, "এখন নাই।"

আমি তার হাত ধরে বললাম, "উঠ। চল, শুবে।"

নীলা বাধ্য মেয়ের মতো বলল, "চল।"

আমি কয়েকদিন খুব দুশ্চিন্তার মাঝে কাটালাম। ব্যাপারটা নিয়ে কার সাথে কথা বলতে পারি সেটাও বুঝি না। নীলার সাথেও কথা বলতে পারি না, দিনের বেলা বিষয়টাকে রীতিমতো হাস্যকর বলে মনে হয়।

কয়দিন পর আবার গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, শুনতে পেলাম নীলা ফিস ফিস করে কথা বলছে। আমি পা টিপে টিপে উঠে গেলাম, গিয়ে দেখি নীলা টেলিভিশনের সামনে উবু হয়ে বসে আছে। শুনতে পেলাম সে মাথা নেড়ে বলছে, "ভয় করে বাবা। অনেক ভয় করে।"

আমি বুকের ভেতর এক ধরনের গভীর শূন্যতা অনুভব করি, নীলা প্রায় মানসিক রোগীর মতো হয়ে গেছে। তার ধারণা সে টেলিভিশনে তার বাবাকে দেখছে, কথা শুনছে।

আমি নীলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম, আমার মনে হলো আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম টেলিভিশন থেকে অস্পষ্ট গলার কেউ একজন বলল, "কোন ভয় নেই।"

"সত্যি বাবা?"

আমি আবার শুনলাম, "হ্যাঁ সত্যি। তুই ছাদ থেকে লাফ দে। তাহলেই তুই আর আমি একসাথে থাকব।"

আতংকে আমার সারা শরীর শীতল হয়ে গেলো। নীলা বলল, "তুমি সব সময় আমার সাথে থাকবে বাবা?"

"থাকব। এই তো আছি দেখছিস না?"

আমি টেলিভিশনের দিকে তাকালাম, সত্যি সত্যি সেখানে একজন মানুষের ছবি দেখা যাচ্ছে। আবছা অস্পষ্ট ছবি কিন্তু মানুষের ছবি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নীলা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, "যাচ্ছি বাবা। তুমি আমার সাথে থাকবে তো?"

"হ্যাঁ থাকব। তোর কোন ভয় নেই।"

নীলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, আমি আতংকে পাথর হয়ে দেখলাম সে ছিটকিনি খুলে বারান্দায় যাচ্ছে। সেখান থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বে?

টেলিভিশন থেকে আবার একটা কণ্ঠস্বর বের হয়ে এলো, "এগিয়ে যা মা। রেলিংয়ের উপর দাঁড়া। আমি যখন বলব, ওয়ান টু থ্রী তখন লাফ দিবি। পারবি না?"

"পারব বাবা।"

"চমৎকার। তাহলে তুই আমার কাছে চলে আসবি। আমার আর তোর কাছে আসতে হবে না।"

"ঠিক আছে।"

আমি তখন দরদর করে ঘামছি। কী করছি বুঝতে পারছি না, কোনমতে নীলার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরলাম। সে ঝটকা মেরে আমার থেকে মুক্ত হয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। আমি আবার তাকে ধরার চেষ্টা করলাম, কীভাবে কীভাবে জানি সে আবার নিজেকে মুক্ত করে নিল। আমি শুনতে পেলাম টেলিভিশন থেকে আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "রেলিংয়ের ওপর দাঁড়া।"

নীলা বলল, "দাঁড়াচ্ছি।"

আমি ভয়ে অধীর হয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, নীলা রেলিংয়ের উপর ওঠে দাঁড়িয়েছে।

টেলিভিশনে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি বলল, "ওয়ান।"

নীলা খুব ধীরে ধীরে তার দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে দাঁড়াল, মনে হল সে বুঝি এক্ষুনি উড়ে যাবে।

টেলিভিশন ছায়ামূর্তি এবারে অনেক স্পষ্ট হয়ে এসেছে, কঠিন আর স্পষ্ট গলায় বলল, "টু।"

আমি তখন ঘরের ভেতরে ছুটে গেলাম, কী করছি না বুঝেই হ্যাচকা টানে টেলিভিশনটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে আছড়ে মারলাম, কয়েকটা বিদ্যুতের স্ফুলিংগ আর পোড়া গন্ধ ভেসে এলো তারপর হঠাৎ সারা ঘর নীরব হয়ে গেলো।

নীলা তখনও রেলিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম সে থরথর করে কাঁপছে। যে কোন মুহূর্তে সে ওখান থেকে পড়ে যাবে। আমি আবার বারান্দায় ছুটে এলাম, শুনলাম নীলা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় ডাকলাম, "নীলা"

নীলা বলল, "আমার কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "তোমার কিছু হয় নি। তুমি নেমে এসো।

নীলা বলল, "আমার ভয় করছে আমি যদি পড়ে যাই?"

আমি পিছন থেকে তাকে ধরে বললাম, "তুমি পড়বে না। আমি আছি না?"

নীলা নিচে নেমে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

ম্যানেজার সাহেব তার স্বল্প শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিশ্বাস হলো?"

আমি অন্ধকার নির্জন কুয়াশা ঢাকা রাতের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কাল দিনের বেলা কী মনে হবে জানি না। এখন তো অবিশ্বাস করার কিছু দেখছি না।"

ম্যানেজার সাহেব হাসলেন, বললেন, "শুয়ে পড়েন। অনেক রাত হয়েছে।"

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। শুতে যাব সেটা ঠিক আছে, ঘুমাতে পারব কী না কে জানে! আমি আবার খুব ভীতু মানুষ!

ছায়ালীন

রবিন জানালার গ্রীল ধরে বাইরে তাকিয়েছিল। এখন তার খুব মন খারাপ, যখন তার খুব মন খারাপ হয় তখন সে এভাবে জানালায় গ্রীল ধরে বাইরে তাকিয়ে থাকে। রবিনের বয়স মাত্র বারো। বারো বছরের বাচ্চার খুব বেশি মন খারাপ হবার কথা না, কিন্তু রবিনের প্রায়ই মন খারাপ হয়। কেন তার মন খারাপ হয় সেটা সে খুব ভাল করে জানে কিন্তু সেটা সে কাউকে বলতে পারবে না। যখন ছোট ছিল তখন বলতো আর তার আব্বু আম্মু ভয় পেয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতো। ডাক্তার তাকে কী ওষুধ দিয়েছিল কে জানে, তখন সে সবকিছু ভুলে গিয়ে শুধু ঘুমাতো। তার কিছু মনে থাকতো না সবকিছু কেমন যেন আবছা দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে যেতো। তাই সে এখন কাউকে কিছু বলে না, যেটা ঘটে সেটা সে সহ্য করে নিজের ভেতর চেপে রাখে। রবিন জানে সে অন্যরকম, কেন সে অন্যরকম সেই কথাটাও সে কখনো কাউকে বলতে পারবে না। তার জায়গায় অন্য কেউ হলে সে নিশ্চয়ই এতদিনে পাগল হয়ে যেতো, রবিন পাগল হয় নি। সে সবকিছু সহ্য করে, একা একা সহ্য করতে গিয়ে তার শুধু মন খারাপ হয়।

রবিন অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা ফেরিওয়ালার দিকে তাকিয়েছিল। ঠিক তখন সে শুনতে পেলো কেউ যেন স্পষ্ট স্বরে বলল, "কী খোকা? তোমার খুব মন খারাপ?"

রবিন না হয়ে অন্য কেউ হলে চমকে উঠে এদিক সেদিক তাকাতো, কাউকে না দেখে ভয়ে আতংকে অস্থির হয়ে যেতো। রবিন এদিক সেদিক তাকালো না শুধু একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এটাই হচ্ছে তার সমস্যা, সে মানুষ জনের কথা শুনতে পায়, মাঝে মাঝে মানুষজনকে দেখতেও পায়। ভয়ংকর ভয়ংকর মানুষ ভয়ংকর তাদের কথাবার্তা। কেন সে তাদের দেখে, তাদের কথা শুনে সে বুঝতে পারে না।

"খোকা। কথা বলছ না কেন? তোমার কী মন খারাপ?"

রবিন এবারে একটু অবাক হলো। সে যাদের কথা শুনে তাদের কথা সাধারণত প্রলাপের মতো, ভীত আতংকিত মানুষের আর্তনাদের মতো। যাদের দেখতে পায় তারাও সেরকম, মাথা থেতলে যাওয়া রক্তে ভেসে যাওয়া পুড়ে বিকৃত হয়ে যাওয়া মানুষ। তারা তার সাথে কথা বলে না ভয়ে ছোটাছুটি করে, চিৎকার করে কাঁদে। কিন্তু এখন সে যার কথা শুনছে সে

ভয়ে আতংকে চিৎকার করছে না, তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করছে। রবিন একটু অবাক হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কে তার সাথে কথা বলতে চাইছে তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করল। আশে পাশে কেউ নেই, সামনে একটা রাস্তা, রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে আসছে। সবাই স্বাভাবিক মানুষ, কোথাও কোনো অস্বাভাবিক মানুষ নেই।

"খোকা! তুমি আমার কথা শুনছ না?"

রবিন বুঝতে পারল না সে প্রশ্নের উত্তর দেবে কী না। এর আগে কেউ তাকে কখনো এভাবে প্রশ্ন করে নি।

"কথা বল আমার সাথে। তোমার কোনো ভয় নেই।"

রবিন ফিস ফিস করে বলল, "কে? কে কথা বলে?"

"আমি। আমাকে তুমি চিনবে না খোকা। আমি ঠিক তোমার মতো একজন!"

"আমার মতো একজন?"

"হ্যাঁ। তোমার মতো একজন। তুমি যেরকম অনেক রকম কথা শোনো অনেক মানুষকে দেখো আমিও সেরকম।"

রবিন এবারে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এদিক সেদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায়?"

"এই তো রাস্তায়। একজন বুড়ো ফেরিওয়ালা দেখছ?"

"হ্যাঁ দেখছি।"

"একটা লুঙি আর সবুজ রংয়ের সার্ট? ঘাড়ে গামছা। আমি সেই মানুষ। আমাকে দেখছ?"

"হ্যাঁ দেখছি। আপনি এখন হাত নাড়ছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি হাত নাড়ছি। তুমি কোথায়? আমি জানি তুমি আছ আশেপাশে, কিন্তু আমি তোমায় দেখছি না।"

"আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। লাল বিল্ডিংটার তিন তালায়। আমিও এখন হাত নাড়ছি।"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ। এখন তোমাকে দেখছি। অনেক দূর তো, তাই ভাল করে দেখা যায় না, তার উপর বয়স হয়েছে তো তাই সবকিছু ঝাপসা দেখি!"

রবিন প্রথমবার উত্তেজিত হয়ে উঠে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, "আপনি কেমন করে আমার সাথে কথা বলছেন?"

"আমরা পারি বাবা। দশ লাখ বিশ লাখে আমাদের মতো একজন দুইজন মানুষের জন্ম হয় যারা এগুলো পারে। তুমি যেরকম আমি সেরকম। আমরা অনেক কিছু দেখি, অনেক কিছু শুনি যেটা অন্যেরা দেখে না শুনে না।"

রবিন একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তাহলে পাগল না?"

মানুষটি হাসল, বলল, "ছিঃ বাবা! পাগল কেন হবে! এটা তোমারে দেওয়া আল্লাহ্‌র একটা ক্ষমতা।"

"আমি চাই না এই ক্ষমতা। কচু ক্ষমতা!"

"ছিঃ বাবা। এভাবে বলে না। আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষমতারে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে আল্লাহ্ নারাজ হবেন।"

"কিন্তু আমার যে ভয় করে—"

"তোমার কোনো ভয় নাই বাবা। আমাদের চারপাশে সবসময় এগুলো হচ্ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ একজন মানুষ এখন আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে—দেখছ?"

"হ্যাঁ দেখছি। রক্তে ভেজা—"

"মানুষটা দুই রাস্তা পরে একসিডেন্টে মারা গেছে। মানুষটা জানে না—সে মরে গেছে। সে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে যাচ্ছে—তার আশে পাশে আরো কয়েকজন মানুষ দেখেছে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। দেখেছ? এই রকম অনেক কিছু হয় চারপাশে। সাধারণ মানুষ এইগুলো দেখে না। এই গুলো বুঝে না। আমরা দেখি, বুঝি। এইটা আমাদের একটা ক্ষমতা।"

"কিন্তু ডাক্তার যে বলে অন্য কথা।"

মানুষটা আবার হাসল, বলল, "ডাক্তারেরা কী জানে? তারা তাদের পরিচিত রোগ শোকের কথা জানে। তার বাইরে কিছু জানে না। তা ছাড়া এইটা তো রোগ না বাবা। এইটা ক্ষমতা। রোগের চিকিৎসা হয়, ক্ষমতার চিকিৎসা হয় না।"

রবিন বলল, "আমি এই ক্ষমতা চাই না। এই ক্ষমতা নাই করে দেওয়া যায় না?"

"সেইটা তো জানি না, বাবা। চেষ্টা করলে তো সবকিছুই হয়। তুমি যদি খুব চেষ্টা করো তাহলে হয়তো আস্তে আস্তে এক সময় ক্ষমতাটা চলে যেতে পারে।" মানুষটা সুর পাল্টে বলল, "কিন্তু তুমি কেন এই ক্ষমতাটা দিয়ে দিতে চাও?"

"সবাই ভাবে আমি পাগল। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া আমার ভয় করে, ভয়ংকর ভয়ংকর মানুষ আসে চিৎকার করে আমারে ভয় দেখায়। আমি পড়তে পারি না ঘুমাতে পারি না।"

"বাবা, তোমারে আমি বলি। তুমি যাদের দেখো তারা হচ্ছে খুব দুঃখী। তারা খুব কষ্টে আছে। তাদের সাহায্যের দরকার, কেউ তাদের সাহায্য করতে পারে না। শুধু তোমার আর আমার মতো মানুষ ইচ্ছা করলে পারে আর কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে না। তুমি তো এখন ছোট, তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই, সেই জন্যে হয়তো কারো সাহায্য কর নাই। যখন আস্তে আস্তে বড় হবে, অভিজ্ঞতা হবে তখন দেখবে তুমিও তাদের সাহায্য করতে পারবে।"

"না-না আমি পারব না। আমি সাহায্য করতে চাই না। আমি কিছু করতে চাই না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা। তুমি যদি না চাও, তাহলে তোমার সাহায্য করতে হবে না। কিন্তু দেখবে, একদিন যখন বড় হবে কারো কষ্ট দেখে তুমি নিজে থেকেই সাহায্য করতে যাবে।"

"না। যাব না।" রবিন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমি কিছু করতে চাই না।"

"ঠিক আছে বাবা, তোমারে কিছু করতে হবে না। শুধু তোমারে একটা কথা বলি।"

"কী কথা?"

"তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ভয় পাবা না। মন খারাপ করবা না। আমি জানি এইটা স্বাভাবিক ব্যাপার না, কিন্তু এইটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নাই। তুমি মন খারাপ করবা না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"আমি এখন যাই বাবা? আমার খুব তাড়া আছে। একজন মানুষ খুব বিপদে পড়েছে, তারে সাহায্য করতে যাচ্ছি।"

"কী বিপদ?"

"খুব বড় বিপদ। মানুষ বেঁচে থাকতে যেরকম বিপদ হয়, মরে যাবার পরেও বিপদ হয়। এই কালে যেরকম জন্তু জানোয়ার আছে, পরকালেও সেইরকম জন্তু জানোয়ার দানব আছে। তারা অনেক সমস্যা করে। তারা বেঁচে থাকার সময় বিপদে পড়লে তারে সাহায্য করা যায়। মরে যাবার পরে তারে অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না—শুধু আমরা চাইলে পারি।

"ও।"

"যাই বাবা?"

"ঠিক আছে।"

"তোমার নামটা তো জিজ্ঞেস করলাম না।"

"আমার নাম রবিন।"

"যাই গো রবিন।"

রবিন দেখলো তার দিকে হাত নেড়ে বুড়ো মতন ফেরিওয়ালাটা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সে অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটার সাথে তার যে কথাটা হয়েছে সেটা সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যিই কী সে শুনেছে নাকি পুরোটা তার কল্পনা? তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে আসলে সে পাগল না, সে যেটা দেখে যেটা শুনে সেটা সত্যি, অন্যেরা সেটা শুনতে পায় না দেখতে পায় না সেটাই হচ্ছে পার্থক্য।

রাত্রি বেলা খাবার টেবিলে আম্মু একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন রবিন আজ বেশ হাসি খুশি। তার অন্য দুই ছেলে মেয়ে থেকে এই ছেলেটি ভিন্ন, এই বয়সেই সে বড়দের মতো গম্ভীর। কথাবার্তা বলে খুব কম, সবসময়েই মনে হয় কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছে। আজকে তাকে একটু হাসি খুশি দেখে আম্মুরও ভাল লাগলো, হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে রবিন? তোর আজকে খুব স্ফূর্তি মনে হচ্ছে?"

রবিন কোনো কথা না বলে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

"কী নিয়ে এতো স্ফূর্তি? কিছু হয়েছে নাকি?"

রবিন মাথা নাড়ল, বলল, "না আম্মু কিছু হয় নাই।"

বড় বোন ঈশিতা বলল, "কিছু হলে তোমাকে রবিন বলবে নাকি? রবিন যদি লটারীতে দশ লাখ টাকা পায় তাহলেও মুখটা এমন করে রাখবে যেন কিছু হয় নাই।"

ছোট ভাই লিটন বলল, "কেন আপু? কেন মুখটা এরকম রাখবে?"

ঈশিতা বলল, "দেখিস না রবিন গুণে গুণে কথা বলে।"

আব্বু বললেন, "কেন আমার ছেলেটাকে জ্বালাতন করছিস?"

ঈশিতা বলল, "আমি মোটেও জ্বালাতন করছি না। সত্যি কথা বলছি।"

আম্মু বললেন, "যাক এতো সত্যি কথা বলতে হবে না।"

ঈশিতা বলল, "আসলে কী হয়েছে জান?"

"কী?"

"রবিনের বয়স আসলে বাহাত্তর। ভুলে সে দশ বছরের ছেলের শরীরে আটকা পড়ে গেছে! তাই না রে রবিন?"

রবিন দাঁত বের করে হেসে বলল, "আর তোমার বয়স আসলে পাঁচ। ভুল করে ষোলো বছরের মেয়ের শরীরে আটকা পড়ে গেছ।"

রবিনের কথা শুনে সবাই হি হি করে হেসে উঠলো! ছেলেটা খুব কম কথা বলে, কিছু একটা বলে হাসাহাসি করলে সবাই অল্পতেই খুশি হয়ে ওঠে।

রবিন আর লিটন এক ঘরে ঘুমায়, ঈশিতা অন্য ঘরে। লিটন ঘুম কাতুরে ছেলে একটু রাত হলেই সে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়। রবিনের বেলায় ঠিক তার উল্টো, যতো রাত হতে থাকে ততই সে যেন জেগে উঠে। সেজন্যে রবিনকে অবশ্যি দোষ দেয়া যায় না, রাত যত গভীর হতে থাকে সে ততই বিচিত্র কথাবার্তা শুনতে থাকে, মাঝে মাঝে বিচিত্র মানুষকে দেখতে পায়। সে ভয়ে কুকড়ে থাকে, চাদরের নিচে মাথা ঢেকে সে গভীর রাত পর্যন্ত ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে।

আজ রাতে সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। আম্মু মশারী গুঁজে দিয়ে লাইট নিভিয়ে চলে যাবার পর রবিন তার বিছানায় হাঁটু মুড়ে বসে লিটনকে ডাকল, "লিটন।"

"কী?"

"ঘুমিয়ে পড়েছিস?"

"না।"

"আচ্ছা লিটন তুই কী কখনো ঘুমের মাঝে কারো কথা শুনতে পাস।"

লিটন মাথা নাড়ল, "নাহ্।"

"তুই কী কখনো ভয়ের স্বপ্ন দেখিস?"

"সব সময় দেখি।"

"কী দেখিস?"

"কালকে দেখেছি একটা বাঘ আমার হাত কামড় দিয়ে খেয়ে ফেলছে। এই মোটা বাঘ—যা ভয় লেগেছিল।"

রবিন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ও।"

রবিন আরো কিছুক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসে থেকে লিটনকে ডাকল, "লিটন।"

লিটন কোনো উত্তর দিল না। রবিন আবার ডাকল, "এই লিটন।"

লিটন ঘুম ঘুম গলায় বলল, "উঁ।" তারপর পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলো।

রবিন একটা নিঃশ্বাস ফেলে, লিটনের উপর তার একটু হিংসে হয়। সেও যদি তার মতো এতো তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারতো তাহলে কী চমৎকারই না হতো!

রবিন হাঁটুতে মাথা রেখে নিঃশব্দে বসে থাকে। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার, জানালা দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে, মেঝেতে সেই আলোটা একটা বিচিত্র নক্সার মতো তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় সে দেখে ঘরের ভেতরে কোনো একজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়ংকর আতংকে সে চাদর দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

রবিন ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালো, তারপর শুয়ে পড়লো। ঠিক যখন তার চোখে ঘুম নেমে আসছিল তখন সে রক্ত শীতল করে একটা আর্তনাদ শুনতে পেলো। রবিন আতংকে চমকে উঠে দুই হাতে নিজের কান বন্ধ করে শুয়ে থাকে। তারপরেও সেই আর্তনাদটি মিলিয়ে যায় না রবিন স্পষ্ট শুনতে পায় একজন মানুষ গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে চিৎকার করছে। রবিন আগে জানতো না সেগুলো কী এখন সে জানে, এগুলো মৃত মানুষের চিৎকার। কেন তাকে তাদের চিৎকার শুনতে হবে? কেন? রবিন দুই হাত দিয়ে কান বন্ধ করে শুয়ে থেকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

গভীর রাতে হঠাৎ রবিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে শুনতে পেলো চাপা স্বরে একজন মহিলা কথা বলছে, "সুমন। আমার সুমন। সুমন কোথায়?"

ঘুম ভেঙ্গে রবিন পুরোপুরি জেগে উঠে কিন্তু তবুও সে বিছানায় ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে।

"কোথায় সুমন? কোথায় গেলি বাবা?"

রবিনের মনে হয় একজন মা তার ছেলেকে খুঁজছে। এতো রাতে তার ঘরে একটা মা কেন ছেলেকে খুঁজে? রবিন খুব সাবধানে চাদর থেকে মাথা বের করে তাকালো, ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটু অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, আবছা আবছা বোঝা যায় সেটি একজন মহিলা। মহিলাটি ব্যাকুল গলায় বলল, "সুমন। বাবা আমার তুই কোথায়?"

তারপর মহিলাটি লিটনের বিছানার কাছে গিয়ে ডাকল, "সুমন! বাবা সুমন।"

লিটন ঘুমের মাঝে অস্পষ্ট একটা শব্দ করে পাশ ফিরে শুলো, মহিলাটি তখন রবিনের বিছানার দিকে এগিয়ে আসে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে আসা এক চিলতে আলোতে মুহূর্তের জন্যে রবিন মহিলাটাকে দেখতে পেলো, মাথার বাম পাশটি থেতলে গেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মহিলাটি রবিনের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়, মশারীর ভেতরে তার মাথাটা ঢুকিয়ে রবিনের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে রবিন মহিলাটির নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়, তার সাথে এক ধরনের কটু গন্ধ। মহিলাটি বলল, "সুমন। বাবা সুমন।"

রবিন নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে, মহিলাটি কাতর গলায় আবার বলল, "সুমন। তুই কোথায় গেলি? কথা বলিস না কেন?"

রবিন ফিসফিস করে নিজেকে বলল, "আমি ভয় পাব না। কিছুতেই ভয় পাব না। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলেই চলে যাবে।"

মহিলাটি কিন্তু চলে গেল না, বলল, "বাবা সুমন। তুই কোথায় গেলি?"

রবিন বিড় বিড় করে বলল, "এখানে নাই।"

"নাই এখানে?"

রবিনের বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে, চাপা গলায় বলল, "না। এখানে নাই।"

"তাহলে সে কোথায় গেল?"

"আমি জানি না। আপনি—আপনি—"

"আমি কী?"

"আপনি অন্য জায়গায় খুঁজেন।"

মহিলাটি একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তো সব জায়গায় খুঁজছি। কোথাও তো পাই না আমার সুমনকে!"

রবিন চোখের কোণা দিয়ে দেখে মহিলাটি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে, দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে একটু শব্দ করল তারপর মহিলাটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। তাকে দেখা না গেলেও রবিন তার গলার স্বর শুনতে পায়, "সুমন। বাবা সুমন। তুই কোথায় গেলি?"

তখন সে আরো কয়েকজন মানুষের গলা শুনতে পায়। কেউ একজন বলল, "রাহেলা তুমি এভাবে সুমনকে পাবে না! তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে তুমি মারা গেছো। তুমি বেঁচে নেই।"

মহিলাটি আবার বলল, "সুমন! আমার সুমন!"

খুব ধীরে ধীরে সবার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাবার পরও রবিন ঘাপটি মেরে শুয়ে রইল। তারপর বুক থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস বের করে সে চাদরটা টেনে নিজেকে ঢেকে পাশ ফিরে শোয়। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না সে একজন মৃত মানুষের সাথে কথা বলেছে। রবিন অবাক হয়ে আবিষ্কার করে তার যেটুকু ভয় লাগার কথা তার সেটুকু ভয় লাগছে না। একটা মা তার ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছে না সেটা চিন্তা করে শুধু তার ভেতরে কেমন জানি একটু দুঃখ লাগছে।

ভোর বেলা খাবার টেবিলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আব্বু খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন, কিছু একটা দেখে হঠাৎ মাথা নেড়ে বললেন, "ইশ!"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আব্বু?"

"আমাদের বাসার কাছে একটা খারাপ একসিডেন্ট হয়েছে। মা আর ছেলে ছিল। মা'টা স্পট ডেড।"

আম্মু বললেন, "আহা রে। ছেলেটা?"

"ছেলেটা বেঁচে গেছে। ক্রিটিক্যালী ইনজুরড। হাসপাতালে আছে।"

রবিনের হঠাৎ কী মনে হল কে জানে, জিজ্ঞেস করল, "আব্বু, ছেলেটার নাম কী সুমন?"

আব্বু অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকালেন, "হ্যাঁ। তুই কেমন করে জানিস?"

রবিন থতমত খেয়ে বলল, "না—মানে—ইয়ে—"

খাবার টেবিলে সবাই অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল। রবিন তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে টোস্টটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করে।

স্কুল থেকে আসার সময় রাস্তার মোড়ে রবিন আর লিটন দাঁড়িয়ে গেল। সামনে অনেক মানুষের ভীড়, ভীড় ঠেলে কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে যাচ্ছে। ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ একটু সরে দাঁড়াতেই মুহূর্তের জন্যে রবিন দেখতে পেলো রাস্তায় একজন মানুষ পড়ে আছে, পুরো জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। লিটন ফ্যাকাসে মুখে বলল, "কী হয়েছে ভাইয়া?"

"একসিডেন্ট।"

"চল ভাইয়া যাই, আমার ভয় করছে।"

লিটন ভীতু প্রকৃতির, রাস্তার মাঝে একসিডেন্টের দৃশ্য দেখে ভয় পাবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সে লিটনের হাত ধরে দুই পা এগিয়ে যেতে যেতে একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালো। পুলিশের সাথে একজন মানুষ উত্তেজিত গলায় কথা বলছে, মানুষটির সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে, একটা হাত বিচিত্রভাবে শরীর থেকে ঝুলছে, দেখে মনে হচ্ছে না এটা তার শরীরের অংশ। রবিন এক পলক দেখেই বুঝতে পারে এটি একসিডেন্টে মরে যাওয়া মানুষটি, সে ছাড়া আর কেউ তাকে দেখছে না।

লিটন রবিনের হাত ধরে টেনে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "চল ভাইয়া।"

"দাঁড়া। তুই এক সেকেন্ড দাঁড়া।"

"তুমি কোথায় যাও?"

"আমি এক্ষুণি আসছি।"

লিটন কিছু একটা বলতে চাইছিল তাকে তার সুযোগ না দিয়ে রবিন ছুটে গেল। পুলিশটার কাছাকাছি এসে শুনতে পায় রক্তে ভেসে যাওয়া মানুষটা বলছে, "লাল রংয়ের পাজেরো। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে গেলো—শুওরের বাচ্চা একবার থামল পর্যন্ত না!"

পুলিশটার হাতে একটা ছোট নোট বই, সেটা অন্যমনস্কভাবে হাত বদল করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকায়। তারপর গলা উঁচিয়ে বলল, "কেউ ভীড় করবেন না। সরে যান।"

মানুষগুলো সরে যাবার কোনো লক্ষণ দেখালো না। পুলিশটা তখন গলা আরেকটু উঁচু করে বলল, "সরে যান সবাই। সরে যান।"

কয়েকজন মানুষ তখন একটু সরে দাঁড়াল।

"কেউ কী দেখেছেন ঘটনাটা? আছে কেউ?"

রক্তাক্ত মৃতদেহটা বলল, "আমি দেখেছি। বললাম তো আমি—লাল পাজেরো। গাড়ির নম্বর ঢাকা গ বারো তারপর চার আট আট—"

"কেউ দেখেছেন?"

রক্তাক্ত মৃতদেহটা বলল, "বললাম তো! আমি দেখেছি। লাল পাজেরো। ড্রাইভারের পাশে একটা মেয়ে বসে আছে—নীল শাড়ি—"

পুলিশটা ভীড়কে সরাতে সরাতে বলল, "না দেখে থাকলে সরে যান। সরে যান সবাই।"

রবিন এবারে পুলিশটার সার্টের হাতা ধরে একটু টান দিল। পুলিশটা ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"লাল পাজেরো।"

"একসিডেন্ট করেছে?"

রবিন মাথা নাড়ল।

"তুমি দেখেছ?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রবিন হড়বড় করে বলল, "ড্রাইভারের পাশে নীল শাড়ি পরা একটা মেয়ে ছিল। গাড়ির নম্বর ঢাকা গ বারো তারপর চার আট আট—"

পুলিশ ভুরু কুচকে বলল, "তুমি দেখেছ।"

রবিন মাথা নাড়ল, বলল, "আরেকজন দেখেছে।"

"সে কোথায়?"

"সে নাই।"

পুলিশটা হাত দিয়ে তাকে সড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গী করে বলল, "সে নাই তো তুমি ভাগো। যাও।"

রবিন বলল, "বিশ্বাস করেন—"

"যাও যাও ভাগো।"

রবিন একটু সরে দাঁড়ালো। রাস্তার পাশে রক্তাক্ত মৃতদেহটি দাঁড়িয়ে ছিল, একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে সে রবিনের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না। কেউ আমার কথা শুনতে চায় না কেন? ব্যাপারটা কী? শরীরে ব্যাথা নাই কেন?"

মানুষটা রবিনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী হয়েছে আমার?"

রবিন ফিস ফিস করে বলল, "আপনি মরে গেছেন।"

মানুষটা মাথা নাড়ল, বলল, "কেন আমি মরে যাব? আমি মরি নাই। এই দেখো আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

রবিন একপা একপা করে পিছনে সরে আসে, তারপর লিটনের দিকে ছুটতে থাকে। লিটন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। রবিনকে দেখে নাক মুছে বলল, "তুমি কী কর ঐখানে। আমার ভয় করে। বাসায় চল।"

"চল। বাসায় চল।"

হাঁটতে হাঁটতে সে পিছনে ফিরে তাকালো। রক্তাক্ত মৃত মানুষটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটা এখনো জানে না সে মরে গেছে। রবিন দেখতে পায় মৃত মানুষটাকে ঘিরে আরো কয়েকজন মানুষ ভীড় করেছে। তারাও মৃত। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে সে মারা গেছে। মানুষটার জন্যে রবিন নিজের ভেতরে বিচিত্র এক ধরনের কষ্ট অনুভব করে।

গভীর রাতে মেয়ে কণ্ঠে কান্নার একটা শব্দ শুনে রবিন জেগে উঠলো। রবিন দুই হাতে কান চেপে ধরে রাখে কিন্তু তবুও শব্দটা চলে গেলো না। রবিন কান থেকে তার হাত দুটো সরিয়ে নেয় এবং হঠাৎ তার মনে হয় শব্দটা পাশের ঘর থেকে আসছে। মনে হচ্ছে ঈশিতা যন্ত্রণায় কাঁদছে।

রবিন লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলো। ঈশিতার ঘরের দরজা ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে যায় আর রবিন শুনতে পায় সত্যি সত্যি ঈশিতা যন্ত্রণায় কাঁদছে।

রবিন ঘরের লাইট জ্বালিয়ে ঈশিতার বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। ঈশিতা কুকড়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। রবিন ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপু! কী হয়েছে তোমার?"

"ব্যথা! খুব ব্যথা করছে পেটে।" ঈশিতা কোনোমতে বলল, "আব্বু আম্মুকে ডাক। তাড়াতাড়ি। মরে যাচ্ছি আমি!"

রবিন আব্বু আম্মুর ঘরে গিয়ে চিৎকার করতে থাকে, "আব্বু আম্মু, তাড়াতাড়ি উঠো! ঈশিতা আপুর পেটে ব্যথা।"

সাথে সাথেই সবাই ঘুম থেকে ওঠে গেলো। রবিনদের ছোট চাচা ডাক্তার, তাকে ফোন করা হলো। কিছুক্ষণের মাঝে চাচা এসে গেলেন। পেটে চাপ দিয়ে কিছু পরীক্ষা করে ছোট চাচা মুখ গম্ভীর করে বললেন, "এপেন্ডিসাইটিস। এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে।"

আব্বু আম্মু আর ছোট চাচা মিলে ঈশিতাকে তখন তখনই হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। রবিন আর লিটন বাসায় রয়ে গিয়েছে। লিটন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ভাইয়া। আপু কী মরে যাবে?"

রবিনের বুকটা ধ্বক করে উঠল কিন্তু সে সেটা বুঝতে দিল না, লিটনকে ধমক দিয়ে বলল, "ধুর গাধা! মরে যাবে কেন?"

"এখন কী হবে ভাইয়া?"

"অপারেশন করবে। অপারেশন করে এপেন্ডিসাইটিস ফেলে দেবে।"

"কেন ফেলে দেবে ভাইয়া?"

উত্তরটা রবিনের ভাল করে জানা ছিল না তাই ইতস্তত করে বলল, "ব্যথা করছে যখন ফেলে দিতে হবে না?"

"আমারও তো মাঝে মাঝে হাটু ব্যথা করে, তখন কী হাটু ফেলে দেয়?"

রবিন একটু রেগে বলল, "বক বক করবি না। এখন ঘুমা।"

"ঘুম আসছে না।"

"তাহলে চুপ করে শুয়ে থাক।"

লিটন চুপ করে শুয়ে রইল। ঘন্টা খানেক পরে হাসপাতাল থেকে আম্মু ফোন করে বললেন, ঈশিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে স্যালাইন আর ওষুধপত্র দিচ্ছে, ব্যথা কমেছে। এখন ঘুমিয়ে আছে। সকালে ডাক্তারেরা এলে অপারেশনের সময় ঠিক করা হবে। কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই।

চিন্তার কোনো কারণ নেই শুনে লিটন প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে গেলো। রবিন দীর্ঘ সময় বিছানায় ছটফট করে ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালের দিকে আম্মু হাসপাতাল থেকে এসে কিছু দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে আবার হাসপাতালে ফিরে গেলেন। রবিন আর লিটনের কেউই স্কুলে গেল না, বাসায় মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দুপুর বেলা খবর পেলো ঈশিতাকে অপারেশন করাতে নিয়ে গেছে। ঘন্টা দুয়েক পরে খবর পেল অপারেশন ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে, এখন ঘুমাচ্ছে।

সন্ধ্যের দিকে আব্বু এসে রবিন আর লিটনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। রবিনের ধারণা ছিল হাসাপাতালে বুঝি হাজার হাজার মানুষ গিজ গিজ করছে, কিন্তু দেখা গেলো এটা মোটেও সেরকম না। প্রাইভেট হাসপাতাল, তার উপর নূতন তৈরি হয়েছে। চারিদিক ঝকঝক তকতক করছে। মানুষের ভীড় নেই। লিফটে করে তারা দোতালায় উঠে এলো। বেশ বড়ো একটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে সুন্দর সুন্দর চেয়ার, সামনে টেলিভিশন। কিছু মানুষ সেখানে চুপচাপ বসে আছে। রবিন জিজ্ঞেস করল, "আব্বু। আপু কোথায়?"

আব্বু একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, "এই খানে। অপারেশন হবার পর কয়েক ঘন্টা এখানে রাখে। ঠিকমতন জ্ঞান ফিরে এলে তখন কেবিনে নিয়ে যায়।"

লিটন জিজ্ঞেস করল, "আপুর ঠিক মতন জ্ঞান ফিরে নাই?"

"ওষুধ দিয়ে রেখেছে তো তাই ঘুমিয়ে আছে।"

রবিন বলল, "আপুকে একটু দেখে আসি?"

আব্বু বললেন, "দাঁড়া। ডাক্তারের সাথে কথা বলে নেই। এটা তো রিকভারী রুম, ডাক্তার নার্স ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারে না।"

"এদের বেশি বাড়াবাড়ি—" মহিলার গলা শুনে তারা মাথা ঘুরিয়ে দেখল মাঝবয়সী একজন মহিলা। রাগ রাগ মুখে বললেন, "আমাকে পর্যন্ত আমার মায়ের কাছে যেতে দিতে চায় না। কতো কাজ ফেলে এসেছি—"

আব্বু বললেন, "সার্জারীর ব্যাপার। একটু কেয়ারফুল থাকা ভাল।"

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের কার কী হয়েছে?"

আব্বু বললেন, "আমার মেয়ে। এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন।" একজন কিছু একটা জিজ্ঞেস করলে তাকে পাল্টাপাল্টি সেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ভদ্রতা। তাই আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার?"

"আমার বাবা। গল ব্লাডার অপারেশন।"

"কেমন আছেন আপনার বাবা?"

"ভাল। কেবিনে নেয়ার জন্যে বসে আছি।" ভদ্রমহিলা রাগ রাগ মুখে বিড় বিড় করে আরো কয়েকটা কথা বলে একটু সরে গেলেন।

আব্বু ডাক্তারের সাথে কথা বলে রবিন আর লিটনকে এক মিনিটের জন্যে ভেতরে নিয়ে যাবার অনুমতি নিলেন। প্রথমে লিটন ঈশিতাকে দেখে এলো। তারপর রবিন, ঠিক তখন আব্বুর একটা ফোন চলে এলো বলে রবিন একাই ঢুকে গেল। বেশ বড় একটা ঘর, তার মাঝে দুই পাশে শুধু দুটি বিছানায় দুজন শুয়ে আছে। একটি বিছানাকে ঘিরে অনেকগুলো মানুষ কাজেই অন্যজন নিশ্চয়ই ঈশিতা। রবিন বিছানাটার কাছে এগিয়ে গেল, ঈশিতা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। রবিন আস্তে করে কপালে হাত রেখে ডাকলো, "আপু।"

ঈশিতা চোখ খুলে রবিনের দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হাসল।

"আপু, তুমি কেমন আছ?"

ঈশিতা বলল, "ভাল।"

"দেরী নাই। আর দেরী নাই, সময় হয়ে গেছে—" পাশের বিছানায় ঘিরে থাকা মানুষগুলো হঠাৎ করে জোরে জোরে কথা বলতে থাকে। রিকভারি রুমে কোনো মানুষ ঢোকার কথা নয়, এতোগুলো মানুষ কেমন করে ঢুকে এতো জোরে কথা বলছে? রবিন ভাল করে তাকিয়ে হঠাৎ একেবারে হতচকিত হয়ে গেলো। এরা আসলে সত্যিকারের মানুষ না। এরা সব মৃত মানুষ। রিকভারি রুমের বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটা নিশ্চয়ই এখন মারা যাবে, আত্মীয় স্বজন সবাই তাকে নিতে এসেছে।

"কষ্ট হচ্ছে নাকি?"

"একটু তো হচ্ছেই। মৃত্যুর একটা কষ্ট থাকে।"

"এইটা শেষ কষ্ট। এরপরে আর কষ্ট নাই।"

ঈশিতা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখিস তুই?"

রবিন বলল, "না কিছু না।"

পাশের বিছানায় ঘিরে থাকা সবগুলো মানুষ তখন একসাথে মাথা ঘুরিয়ে রবিনের দিকে তাকালো। চোখের দৃষ্টি কী তীব্র, রবিনের বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

বুড়ো মতন একজন মানুষ রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "খোকা তুমি আমাদের দেখতে পাও?"

রবিন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। পাই।"

"আশ্চর্য!" মানুষগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকালো, তারপর আবার রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এখন যাও। মানুষের মৃত্যু মূহুর্ত খুব ভয়ানক।" -

"যাই। আমি যাই।"

ঈশিতা দুর্বল হাতে রবিনের হাত ধরে নিচু গলায় বলল, "তুই কার সাথে কথা বলিস?"

"কারো সাথে না—"

"তাহলে?"

"আমি এখন যাই আপু। এই রোগীটা এক্ষুনি মারা যাবে।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"পরে বলব আপু—" রবিন কথা শেষ না করেই বাইরে বের হয়ে আসে। রোগীর আত্মীয় স্বজন চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশনে খবর শুনছে। তারা কেউ জানে না তাদের রোগীটি এক্ষুনি মারা যাবে।

রবিন কান খাড়া করে রেখেছিল, হঠাৎ করে রিকভারী রুমের ভেতর থেকে একটা এলার্মের মতো শব্দ শুনতে পেল। প্রথমে একজন নার্স তারপরে বেশ কয়েকজন ডাক্তার হঠাৎ ছোটাছুটি করতে শুরু করে।

রবিন নিঃশব্দে বসে থাকে, সে জানে ছোটাছুটি করে কোনো লাভ নেই। এই মানুষটিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

ঈশিতা তার বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসে আছে। বিছানায় তার পায়ের কাছে বসেছে রবিন। কেবিনে এখন আর কেউ নেই। ঈশিতা দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "বল।"

ঈশিতা কী শুনতে চাইছে রবিন খুব ভাল করে জানে তারপরেও সে না বোঝার ভান করল, বলল, "কী বলব?"

"রিকভারী রুমে তুই কী দেখেছিলি? কার সাথে কথা বলছিলি?"

"আমি কাউকে দেখি নাই, কারো সাথে কথা বলি নাই।"

"মিথ্যে কথা বলবি না, কান ছিড়ে ফেলব তাহলে।"

রবিন দুর্বল গলায় বলল, "আমি মিথ্যা কথা বলছি না।"

"এইটাও একটা মিথ্যা কথা।" ঈশিতা হাত নেড়ে বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেছি নিজের কানে শুনেছি—"

"তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রেখেছিল। ঘুমের মাঝে কী দেখতে কী দেখেছ, কী শুনতে কী শুনেছ—"

"আমি মোটেও ঘুমাচ্ছিলাম না রবিন। আমার সাথে ফাজলামো করবি না। কী হয়েছিল বল।"

"কিছু হয় নাই।"

"তুই বললি রোগীটা এক্ষুনি মারা যাবে। সত্যি সত্যি মারা গেলো। কেমন করে তুই জেনেছিলি—"

রবিন কোনো কথা না বলে উদাস মুখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। ঈশিতা এবারে একটু অনুনয় করে বলল, "রবিন। সোনা ভাই, আমাকে বল প্লীজ। আমি কাউকে বলব না।"

রবিন এবারে ঈশিতার দিকে তাকালো। ঈশিতা বলল, "তুই কাছে আয়, তোর গা ছুয়ে আমি বলছি, খোদার কসম আমি কাউকে বলব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

রবিন কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"না।"

"কী না?"

"আমি বলতে পারব না।"

ঈশিতা চোখ বড় বড় করে বলল, "কেন বলতে পারবি না?"

"আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আব্বু আম্মুকে বলেছিলাম। মনে নাই তখন কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে নাই? ওষুধ দিয়ে আমাকে ছ্যাড়াভেড়া করে দিয়েছিলো। আমি দিন রাত খালি ঘুমাতাম—"

ঈশিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল, বলল "তুই সত্যি সত্যি কিছু একটা দেখিস?"

রবিন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ।"

"তাদের কথাও শুনিস?"

"হ্যাঁ।"

"দেখতে কী রকম?"

"তোমাদের বললে তোমরা বুঝবে না।"

"কাদেরকে দেখিস?"

রবিন এক মূহুর্ত দ্বিধা করে বলল, "যারা মরে গেছে তাদের।"

ঈশিতা চমকে উঠল, "সত্যি?"

রবিন মাথা নাড়ল।

"তাদের কথা শুনে তুই বুঝতে পেরেছিলি রোগীটা মারা যাবে?"

রবিন আবার মাথা নাড়ল। ঈশিতা বুক থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! তোর ভয় করে না?"

রবিন মাথা নাড়ল, "করে। অনেক ভয় করে।" এক মূহুর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তুমি কাউকে বলবে না তো?"

"বলব না।"

"খোদার কসম?"

ঈশিতা বলল, "খোদার কসম। আয় তুই কাছে আয়।"

রবিন কাছে এলে ঈশিতা তার হাত ধরে বলল, "এই যে তোর গা ছুয়ে বলছি, আমি কাউকে বলব না। আর শোন—"

"কী?"

"যদি তোর কখনো ভয় করে, তুই আমাকে বলবি। বুঝলি?"

রবিন মাথা নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল ঠিক তখন কেবিনের দরজা খুলে আব্বু এসে ঢুকলেন বলে কথাটা আর বলা হল না।

অনেকদিন থেকে আব্বুর গ্রামের বাড়িতে যাবার কথা। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল সবাই মিলে কম পক্ষে দশদিনের জন্যে যাবে। পূজার ছুটিতে যখন পরিকল্পনা পাকাপাকি করা হলো তখন দেখা গেলো ঈশিতার পরীক্ষা সে যেতে পারবে না। তাই ঈশিতাকে একেবারে একা না রেখে রবিনকেও রেখে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আব্বু ছুটি নেবার সময় আবিষ্কার করলেন একটানা এতো দিন ছুটি নেয়া এতো সহজ ব্যাপার নয় তাই দশ দিনের ভ্রমণকে কমিয়ে পাঁচদিনে নামিয়ে নিয়ে এলেন।

যাবার আগে আম্মু অনেক ধরনের উপদেশ দিয়ে গেলেন। বাসায় ঈশিতা আর রবিন ছাড়াও ফুলি-খালা থাকবে। ফুলি-খালা তাদের বাসায় অনেকদিন থেকে আছে, আম্মু তার উপর বিশ্বাস করে আগেও বাচ্চাদের রেখে গেছেন। ফ্রীজে রান্না করে কিছু খাবার রাখা হয়েছে। আলমারীতে শাড়ির নিচে খামের ভেতরে কিছু টাকা রয়েছে। পাঁচদিন খুব বেশি সময় নয়, তারপরেও কোনদিন কার কোন জামা কাপড় পরতে হবে আম্মু সেগুলোও বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

আম্মু আব্বু লিটনকে নিয়ে চলে যাবার পর সন্ধ্যেবেলা ঈশিতা আর রবিন আবিষ্কার করল বাসাটা একটু বেশি নির্জন। ঠিক কী কারণ জানা নেই তাদের খিদে পেলো তাড়াতাড়ি। রাতের খাবার খাওয়ার সময় তারা বেশি কথাবার্ত্তা বলল না। ঈশিতা আবার তার পড়াশোনাতে ব্যস্ত হয়ে গেলো রবিন টেলিভিশনে আধখানা বাংলা নাটক দেখে বিজ্ঞাপনের যন্ত্রণায় বিরক্ত

হয়ে টেলিভিশন বন্ধ করে নিজের রুমে ফিরে এলো। খানিকক্ষণ ইংরেজী পড়ার চেষ্টা করে তার ঘুম পেয়ে গেলো, ফুলি খালা মশারী টানিয়ে দিয়ে গেল, রবিনও দাঁত ব্রাশ করে শুয়ে পড়ল।

গভীর রাতে রবিনের ঘুম ভেঙ্গে গেলো—ঠিক কী জন্যে ঘুম ভেঙ্গেছে রবিন বুঝতে পারছিল না কিন্তু তারপরেও পাশ ফিরে শুয়ে নিজের অজান্তেই কিছু একটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যিই সে একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলো। ছোট একটা বাচ্চার কান্না। ফুপিয়ে ফুপিয়ে বাচ্চাটি কাঁদছে। রবিন দুই হাত দিয়ে নিজের কান ঢেকে শুয়ে রইল কিন্তু শব্দটি চলে গেলো না। তখন সে বিছানায় উঠে বসে কে কাঁদছে দেখার চেষ্টা করে। তার ঘরের এক কোনায় জমাট বাধা খানিকটা অন্ধকার মাঝে মাঝে সেটা একটু একটু নড়ছে সেখান থেকেই কান্নার শব্দটা আসছে। দেখে মনে হয় একটা শিশু। ঘরে আলো জ্বেলে রাখলে অনেক সময় এরা চলে যায়, সেভাবে কিছুক্ষণ ঘরের আলো জ্বেলে শিশুটাকে ঘর থেকে বাইরে বের করে দেবার চেষ্টা করবে কী না ঠিক বুঝতে পারল না। রবিন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চাপা গলায় শিশুটিকে ডাকল, "এই।"

সাথে সাথে কান্নার শব্দ থেমে গেলো। বাচ্চাটি চলে যায় নি, ঘরের কোনায় জমাট বাধা অন্ধকারটি এখনো দেখা যাচ্ছে। রবিন আবার ডাকল, "এই, তুমি এখানে আছ?"

রবিন বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিল না। রবিন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাঁদছ কেন?"

এবারে বাচ্চাটি উত্তর দিল, "আমার ভয় করছে।"

রবিন কখনোই এরকম একটি উত্তর আশা করে নি, অবাক হয়ে বলল, "তোমার ভয় করছে?"

"হ্যাঁ।"

"কীসের ভয়?"

"আমি হারিয়ে গেছি। আমি কোথায় যাব জানি না।"

রবিন এতো অবাক হলো বলার নয়। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় যাবে জান না?"

"না।"

"তুমি এখানে এসেছ কীভাবে?"

"আমাকে—আমাকে—"

"তোমাকে কী?"

"আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল, ধরে নিতে চাচ্ছিল তখন দেখলাম এখানে ভয় নাই—তখন এখানে ঢুকে গেছি।"

"কে তোমাকে ধরে নিতে চাচ্ছিল?"

"আমি চিনি না।"

"কেন তোমাকে ধরে নিতে চাচ্ছিল?"

"আমি জানি না।"

"তোমার আম্মু আব্বু নাই?"

"আছে।"

"তারা কোথায়?"

"জানি না।"

তারা বেঁচে আছে না মারা গেছে সেটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রবিন থেমে গেল। একটা ছোট বাচ্চাকে কেমন করে কেউ এই কথা জিজ্ঞেস করে?

বাচ্চাটা হঠাৎ ফুপিয়ে উঠল। রবিন বিছানা থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?"

"ঐ যে আসছে। আমাকে ধরে নিতে আসছে! কী হবে এখন?"

"কে আসছে? কে?"

রবিন বিছানা থেকে নেমে ছোট বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে যায় আর ঠিক তখন ঘরের ভেতরে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। রবিন অবাক হয়ে দেখল, ঘরের মাঝখানে ধোঁয়ার মতো কিছু একটা জমাট বাঁধছে, দেখতে দেখতে সেটা কুৎসিত আধা মানুষ আধা পশুর মতো বিচিত্র একটা প্রাণীর রূপ নিয়ে নিলো। খাটো রোমশ দেহ, উঁচু কপাল আর কপালের নিচে দুটি চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে।

এটি মানুষ নয়, মানুষের মতো কোনো একটি প্রাণী। রবিন নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে, প্রাণীটি ছোট বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এক ধরণের জান্তব শব্দ করল। রবিন বাচ্চাটার সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাতে বাচ্চাটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাও! তুমি যাও! যাও এখান থেকে।"

প্রাণীটা তার ছোট ছোট চোখ দুটি দিয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। রবিন ফিস ফিস করে বলল, "তুমি যাও। যাও এখান থেকে—"

প্রাণীটি তবু চলে গেলো না। হাতের কাছে লাইট সুইচটা আছে, হঠাৎ করে লাইট জ্বালিয়ে দিলে প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে যাবে—কিন্তু ছোট বাচ্চাটির কী হবে? তীব্র আলোতে সেটাও তো থাকতে পারবে না—কোথায় যাবে তখন এই বাচ্চাটি?

রবিনের হঠাৎ করে তখন চার্জারের সাথে লাগানো টর্চ লাইটটার কথা মনে পড়ল। এক ছুটে সেটার কাছে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে লাইটটা হাতে নিয়ে সেটা প্রাণীটার মুখের উপর জ্বালিয়ে দেয়—যন্ত্রণার একটা আর্ত

চিৎকার শুনতে পেলো, সাথে সাথে একটা পোড়া গন্ধে ঘরটা ভরে যায়। একটা লুটোপুটির শব্দ হল তারপর হঠাৎ করে ঘরটা নীরব হয়ে গেলো। এতো নীরব যে মনে হয় নিঃশ্বাসের শব্দটাও শোনা যাবে। প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রবিন লাইটটা নিভিয়ে দিল, আবছা অন্ধকারে ঘরটা ঢেকে গেল সাথে সাথে। রবিন নিচু গলায় ডাকল, "এই ছেলে।"

কোনো উত্তর নেই। বাচ্চাটিও কী তাহলে চলে গেছে?

রবিন আবার ডাকলো, "এই ছেলে।"

এবারে সে ফুপিয়ে কান্নার একটা শব্দ শুনতে পেলো।

"কোথায় তুমি?"

"এই যে। এখানে।"

রবিন বিছানার কাছে তাকালো। তার বিছানা আর টেবিলটার পাশে ছোট একটা জায়গায় সে গুটি গুটি মেরে বসে আছে। রবিন বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে যায়। আবছা অন্ধকারে বাচ্চাটা তার দিকে তাকালো, কী সুন্দর মায়াকাড়া চেহারা। বড় বড় দুটি চোখ, কোকড়ানো চুল। এর আগে যখনই কাউকে দেখেছে তাদের শরীর ছিল রক্তাক্ত, মাথা থেতলানো, মুখ বিকৃত শুধু এই ছেলেটির শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। রবিন অবাক হয়ে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরের আলো জ্বালিয়ে বাচ্চাটিকে ঠিক করে দেখতে পারলে হতো কিন্তু রবিন তার সাহস করলো না। সে জানে তীব্র আলোতে এদের কষ্ট হয়।

"তোমার কী হয়েছিল?"

"আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।"

"তারপরে?"

তারপর আমি দেখি আমি সিঁড়িতে পড়ে আছি। আমার আম্মু আর আব্বু আমাকে নিয়ে গাড়ি করে কোথায় জানি নিয়ে গেল—"

"নিশ্চয়ই হাসপাতালে?"

বাচ্চাটা মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ হাসপাতালে।"

"তখন তুমি কী করলে?"

"আমি চিৎকার করে আমার আম্মু আর আব্বুকে ডাকলাম। তারা আমার কথা শুনল না।"

"তখন?"

"তখন আমি পিছনে পিছনে যেতে চাইলাম, তারপর আমি হারিয়ে গেলাম!" বাচ্চাটা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কেউ তোমাকে নিতে আসে নাই?"

"না।"

"কেউ না? বয়স্ক মানুষ। সাদা কাপড় পরা মানুষ তোমার কাছে আসে নাই?"

"না।"

"একজনও আসে নাই?"

"না।"

ঠিক এরকম সময় দরজা খুলে ঈশিতা এসে ঢুকলো, অবাক হয়ে বলল, "রবিন? কার সাথে কথা বলিস?"

ছোট বাচ্চাটা ভয়ে চিৎকার করে মুখ ঢেকে ফেলে। রবিন ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ঈশিতাকে বলল, "শ-স-স-স-"

ঈশিতা ফিস ফিস করে বলল, "কী হয়েছে?"

"বলছি আপু। অনেক সিরিয়াস ব্যাপার।"

ছোট বাচ্চাটা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি আম্মুর কাছে যাব। আম্মুর কাছে যাব।"

রবিন নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী ছেলে?"

"জয়।"

"জয় তুমি কেঁদো না।"

"আমার ভয় করে।"

"ভয়ের কিছু নেই জয়। আমরা আছি না।"

"তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো?"

"না যাব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "তুই কার সাথে কথা বলছিস?"

"বলছি আপু। বাইরে আস—"

জয় চিৎকার করে বলল, "না, না, আমাকে ছেড়ে বাইরে যেও না। আমার ভয় করে।"

"তোমার কোনো ভয় নেই জয়। আমি যাব না। আমি এখানেই আছি। তুমি চুপ করে বসে থাক।"

জয়কে বসিয়ে রবিন বাইরে বের হয়ে এলো, ঈশিতা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুই কার সাথে কথা বলছিস?"

"একটা ছোট ছেলে, নাম জয়।"

"তুই একটা ছোট ছেলেকে দেখছিস?"

"হ্যাঁ।"

"সে তোর সাথে কথা বলছে?"

"হ্যাঁ আপু।"

"ছেলেটা আসলে মরে গেছে?"

রবিন ইতস্তত করে বলল, "এইটাই হচ্ছে সমস্যা। আমি দেখেছি যখন কেউ মারা যায় তখন তার সব আত্মীয় স্বজন, অন্যান্য মারা যাওয়া মানুষেরা তার কাছে চলে আসে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"এই ছেলেটার বেলায় অন্যরকম। সে একা। সে হারিয়ে গেছে। কেউ তাকে নিতে আসছে না—ভয়ংকর প্রাণী শুধু ভয় দেখাচ্ছে, নিয়ে যেতে চাইছে।"

ঈশিতা বলল, "তার মানে কী?"

"আমি জানি না। শুধু মনে হচ্ছে—"

"কী মনে হচ্ছে?"

রবিন ইতস্তত করে বলল, "মনে হচ্ছে ছেলেটা আসলে মারা যায় নি।

"তাহলে?"

"শুধু তার শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে।"

"কী বলছিস তুই? সেটা আবার কী"

রবিন মাথা নাড়ল, "সেটা আমি জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে এখনো পুরোপুরি মারা যায় নি। আমার মনে হচ্ছে যদি আমরা এখন জয়কে তার শরীরের কাছে নিয়ে যেতে পারি তাহলে হয়তো বেঁচে যাবে।"

ঈশিতা অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "তুই কেমন করে এটা জানিস?"

"আমি জানি না। আমি আসলে কিছু জানি না। আমার শুধু এটা মনে হচ্ছে।"

"তাহলে? তাহলে এখন কী করবি"

রবিন কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। ঈশিতা রবিনের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে এখন খুঁজে বের করতে হয়, ছেলেটার শরীর কোথায় আছে।"

"কেমন করে বের করবে?"

"আয় হাসপাতালে হাসপাতালে ফোন করি।"

"ঠিক আছে।" রবিন বলল, "আমি দেখি ছেলেটার সাথে কথা বলে আরো কিছু খবর বের করতে পারি কী না।"

রবিন বাচ্চাটার সাথে কথা বলে নূতন কিছুই বের করতে পারল না। ঈশিতা তখন একটা ডাইরী খুঁজে বের করল, তার মাঝে সব হাসপাতালের টেলিফোন নম্বর দেয়া আছে। সে একটা একটা নাম্বার বের করে টেলিফোন করতে শুরু করে। এতো রাতে কেউ সহজে টেলিফোন ধরতে চায় না,

টেলিফোন ধরলেও উত্তর দিতে চায় না, তার মাঝেও ঈশিতা লেগে থাকলো। ঘন্টাখানেক চেষ্টা করে যখন ঈশিতা প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল তখন হঠাৎ করে একটা হাসপাতালের রিসেপশনিষ্ট ঘুম ঘুম গলায় বলল, সন্ধ্যেবেলা তাদের এখানে একটা ছোট বাচ্চাকে আনা হয়েছে। মাথায় ব্যথা পেয়ে অজ্ঞান হয়েছিল সে যতদূর জানে এখনো জ্ঞান ফিরে নি। ঈশিতা বাচ্চাটার নাম জানতে চাইছিল রিসেপশনিস্ট বলতে পারল না। বাচ্চার আত্মীয় স্বজন কেউ আশে পাশে আছে কী না জিজ্ঞেস করল, রিসেপশনিস্ট সেটাও বলতে পারল না। হাসপাতালের নাম প্যারামাউন্ট হাসপাতাল, তাদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

টেলিফোনটা রেখে ঈশিতা রবিনকে জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করবি?"

রবিন মাথা চুলকে বলল, "ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালে যাই।"

"এতো রাতে যাবি কেমন করে?"

"স্কুটার ক্যাব কিছু একটা পাওয়া যাবে না?"

ঈশিতা বলল, "দেখি চেষ্টা করে।"

রবিন বলল, "না পেলে হেঁটে চলে যাব।"

তাদের অবশ্যি হেঁটে যেতে হলো না, বাসা থেকে বের হবার পর কিছুক্ষণের মাঝেই একটা রিকশা পেয়ে গেলো। এতো রাতে রিকশাওয়ালা কী করছে সেটা একটা রহস্য। রাস্তায় দুবার পুলিশ রিকশাকে থামালো, ঈশিতা বলল, জরুরি কাজে হাসপাতালে যাচ্ছে এতো রাতে এভাবে রিক্সা করে যাওয়ার ব্যাপারটা পুলিশ ভাল চোখে দেখল না কিন্তু হাসপাতালে যাচ্ছে শুনে শেষ পর্যন্ত যেতে দিল।

যে ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা অবশ্যি রবিন ছাড়া আর কেউ জানল না। সেটি ছিল ছোট বাচ্চাটাকে রাজী করিয়ে তাদের সাথে আনা। সে কিছুতেই ঘরের বাইরে যেতে চাইছিল না, তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে শেষ পর্যন্ত আসতে রাজী হয়েছে। সত্যিকারের একজন বাচ্চাকে হাত ধরে বা কোলে করে নেয়া যায়। কিন্তু যাকে স্পর্শ করা যায় না দেখা যায় না শোনা যায় না কিন্তু সত্যিকার একটা শিশুর মতো অবুঝ তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া খুব সহজ না। রবিন অনেক কষ্ট করে বাচ্চাটিকে নিজের শরীরের কাছাকাছি রেখে কোনোভাবে তাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে এলো।

হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ব্যাপারটি অবশ্যি সহজ হয়ে গেলো। জয়ের মা আই.সি. ইউয়ের বাইরে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন, জয় আম্মু আম্মু বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গিয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা কেমন যেন চমকে মুখ তুলে তাকালেন। তার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, বলল, "কী হয়েছে মা?"

মা বললেন, "কী আশ্চর্য! আমার মনে হল আমার জয় যেন আমাকে আম্মু আম্মু বলে ডাকল।"

কেউ দেখতে পাচ্ছিল না শুধু রবিন দেখল জয় পাগলের মতো তার মায়ের মুখটি ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু ধরতে পারছে না। ব্যাকুল হয়ে সে কাঁদতে শুরু করল, "আম্মু, তুমি আমার দিকে তাকাও না কেন? কথা বল না কেন?"

রবিন তখন বাচ্চাটিকে ডাকল, "জয়।"

যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সবাই চমকে উঠে রবিনের দিকে তাকালো। রবিনের কিছু করার নেই, সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝেই তাকে বাকী কাজটুকু করতে হবে, সে ফিস ফিস করে বলল, "জয়। তোমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না!"

"কেন দেখতে পাচ্ছে না?"

"তুমি তোমার শরীর থেকে বের হয়ে গেছ। তুমি যাও, তোমার শরীরের ভেতরে যাও। তাহলে সবাই তোমাকে দেখবে। যাও।"

"কোথায় আমার শরীর?"

"এই ঘরটার ভেতরে। এসো আমার সাথে—"

আই সি ইউ তে কারো ঢোকার কথা নয়, কিন্তু কেউ রবিনকে বাধা দিল না। সবাই বিস্ফারিত চোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল এবং তার ভিতরে সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলো। সাড়ি সাড়ি বিছানায় মরণাপন্ন রোগীরা শুয়ে আছে, তার মাঝে জয় রবিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। রবিন না তাকিয়েও বুঝতে পারে হাসপাতালের সব নিয়ম ভেঙ্গে তার পাশে জয়ের মা বাবা ভাই বোন দাঁড়িয়ে আছে। কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে ডাক্তার নার্সও তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন আর এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় নেই। রবিন জয়ের বিছানাটি খুঁজে বের করল, ছোট শিশুটির শরীরে নানা রকম যন্ত্রপাতি লাগানো, সে নিথর হয়ে শুয়ে আছে। রবিন জয়কে দেখালো, "এই যে। এটা তোমার শরীর। তোমার এখানে ঢুকতে হবে।"

"আমি কেমন করে ঢুকব।"

"আমি জানি না। কিন্তু ঢুকতে হবে। যদি না ঢুকো তাহলে তোমার মা কোনোদিন তোমাকে দেখতে পাবে না। যাও দেরী করো না।"

জয় বিভ্রান্তের মতো একবার রবিনের দিকে তাকালো, আরেকবার তার মায়ের দিকে তাকালো। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমার ভয় করে।:

"ভয় করলে হবে না। জয়, যাও—দেরী করো না।"

জয়ের নিথর দেহের চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তারা সবিস্ময়ে দেখলেন তার শরীরটি কেমন জানি কেঁপে উঠল, হাতটা একটু তোলার চেষ্টা করল। মাথাটা একপাশ থেকে অন্যপাশে নাড়ালো। সমস্ত শরীরে

একটা ঝিঁচুনীর মতো হলো তারপর হঠাৎ সে চোখ খুলে তাকিয়ে কাঁদতে শুরু করল তার শরীরে লাগানো অনেকগুলো যন্ত্রপাতি হঠাৎ করে সচল হয়ে বিপ বিপ শব্দ করতে শুরু করল। জয়ের মা পাগলের মতো তার সন্তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, দুজন ডাক্তার তাকে ধরে টেনে সরানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

কে একজন রবিনের কনুই ধরে টান দিচ্ছে রবিন মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে ঈশিতা। ঈশিতা ফিস ফিস করে বলল, "বের হয়ে আয়। কুইক।"

রবিন দ্রুত বের হয়ে আসে। এই মুহূর্তে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে না। এখনই তাদের সরে যেতে হবে। এক্ষুণি। তা না হলে আর কোনোদিন তারা এখান থেকে বের হতে পারবে না। যে ব্যাপারটা ঘটেছে সেটা কাউকে রবিন বোঝাতে পারবে না।

গভীর রাতে রিকশা করে দুই ভাই বোন বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। ঈশিতা গভীর মমতায় তার ছোট ভাইটিকে ধরে রেখেছে। যাকে সে কখনো বুঝতে পারে নি, আজকে সে জেনে গেছে তাকে কখনো সে বুঝতে পারবেও না।

খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতে শারমিন হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আম্মু তুমি কী ভূতে বিশ্বাস কর?"

লাবণী চোখের কোনা দিয়ে মেয়েকে এক নজর দেখে বলল, "তুই বিশ্বাস করিস?"

শারমিন বলল, "আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

লাবণী প্লেটে একটু ভাত নিতে নিতে বলল, "ভূত বিশ্বাস করি কী না জানি না তবে পেত্নী বিশ্বাস করি।"

শারমিন হেসে ফেলল, বছর দুয়েক আগে তার বাবা মায়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে। নীলা নামের কম বয়সী যে মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্যে শারমিনের বাবা সাজ্জাদ তার স্ত্রী-কন্যাকে ছেড়ে চলে গেছে তাকে এই বাসায় পেত্নী বলে সম্বোধন করা হয়। নীলার চেহারা খারাপ নয় কিন্তু একজন মানুষকে অপছন্দ করলে তার সবকিছুকেই খারাপ লাগে। শারমিন বলল, "আম্মু, আমি সত্যিকার ভূতের কথা বলছি।"

"সত্যিকার ভূত?"

"হ্যাঁ।"

লাবণী বলল, "তুই যদি এখন আমাকে জিজ্ঞেস করিস যখন লাইট জ্বলছে, ফ্যান ঘুরছে, টেলিভিশন চলছে, আশে পাশে লোকজন—তখন আমি বলব, ভূত বলে কিছু নাই! কিন্তু মনে কর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি, রাত্রিবেলা জোছনার আলোতে বারান্দায় বসেছি। বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড়ে বাতাসের শিরশির শব্দ হচ্ছে দূরের গোরস্তান থেকে শেয়াল ডেকে উঠল, তখন যদি জিজ্ঞেস করিস ভূত বলে কিছু আছে কী না তখন আমি বলব, ইয়ে মানে পৃথিবীতে ব্যাখ্যা করা যায় না সেরকম তো কতো কিছুই আছে! ভূত তো থাকতেও পারে।"

শারমিন গম্ভীর মুখে বলল, "তার মানে তুমি পরিষ্কার করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।"

লাবণী বলল, "কে বলেছে দিলাম না? আমি বলেছি ভূত বলে কিছু নাই কিন্তু ভূতের ভয় আছে!"

শারমিন হি হি করে হেসে উঠল, বলল, "তুমি যে কী অদ্ভুত কথা বল আম্মু! একটা জিনিষ যদি না থাকে তাহলে তার ভয়টা থাকে কেমন করে?"

"থাকতে পারে না?"

"না।"

"মাকড়শা?"

শারমিন একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে মাকড়শায়?"

"তুই মাকড়শাকে ভয় পাস না? এই টুকুন ছোট একটা মাকড়শাকে দেখলে তুই চিৎকার করে ছুটে পালাস কি না?"

"হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?"

"এই রকম ছোট একটা মাকড়শাকে ভয় পাওয়ার পিছনে কোন যুক্তি আছে? এই মাকড়শা তোকে খেয়ে ফেলবে?"

শারমিন বলল, "সেটা তো অন্য জিনিষ। মাকড়শাকে দেখলেই কেমন গা শির শির করে উঠে—"

লাবণী বলল, "একই জিনিষ। ভয় পেতে হলে তার পিছনে যুক্তি থাকতে হয় না। এই টুকুন মাকড়শাকে ভয় পাবার কিছু নাই কিন্তু তুই ভয় পাস! ভূত বলে কিছু নাই কিন্তু মানুষ ভূতকে ভয় পায়।"

শারমিন হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল, "তোমার যুক্তি হচ্ছে একেবারে উল্টাপাল্টা যুক্তি! তুমি তোমার ছাত্রীদের কী পড়াও খোদাই জানে। সব নিশ্চয়ই উল্টাপাল্টা জিনিষ শিখিয়ে দিয়ে এসো।"

"ছাত্রী—এত দূরে যাচ্ছিস কেন? তুই কী দোষ করলি। তোকে উল্টাপাল্টা কিছু শিখাই নাই?"

"নিশ্চয়ই শিখিয়েছ, আমি যেটা টের পাই না। আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই টের পায় আর আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে!"

শারমিন কিছু বলল না, হয়তো আম্মুর কথাই ঠিক। বিচিত্র জিনিষ আছে বলেই হয়তো পৃথিবীটা সুন্দর। সবকিছু যদি ছকে বাধা নিয়ম মাফিক হতো তাহলে পৃথিবীটা হয়তো একঘেঁয়ে হয়ে যেতো।

এই অক্টোবরে শারমিনের বয়স হবে আঠারো। লাবণী খেতে খেতে মেয়ের দিকে তাকালো, যে বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেছে মেয়েটার চেহারায় সেই বাবার চেহারার একটা ছাপ আছে। ঠিক কোথায় সে ধরতে পারে না, হয়তো চোখে কিংবা কথা বলার ভঙ্গীতে। এই কথা বলার ভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হয়ে লাবণী এক সময় সাজ্জাদকে পাগল হয়ে বিয়ে করেছিল। কে জানে এই কথা বলার ভঙ্গী দেখেই মুগ্ধ হয়েই হয়তো নীলা নামের কমবয়সী মেয়েটাও তার সংসারটা ভেঙ্গে নিয়ে চলে গেছে। দুই বছর আগের ঘটনা কিন্তু এখনো বুকের ভেতর কেমন যেন দগদগে একটা ঘা। এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা লাবণী স্বপ্নেও বিশ্বাস করতো না, অথচ ঠিক তার জীবনেই এটা

ঘটে গেলো। যে মানুষটার জন্যে সে সবকিছু দিয়ে দিতে পারতো তার জন্যে এখন কোন অনুভূতি নেই। লাবণী ভেবেছিল সাজ্জাদের জন্যে বুঝি তার বুকের ভেতর একটা তীব্র ঘৃণা থাকবে কিন্তু সেটিও নেই। কে জানে কোন অনুভূতি না থাকা হয়তো তীব্র ঘৃণা থেকেও ভয়ংকর।

লাবণীর জন্যে পুরো ব্যাপারটা ছিল খুব কষ্টের কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামলে নিয়েছে। শারমিন সামলে নিতে পারে নি। সাজ্জাদের সাথে তার ভিন্ন একটা জগৎ ছিল, বাবা এবং মেয়ের ভালবাসার জগৎ। সেই জগৎটাই ওলট পালট হয়ে গেছে। শারমিন মাঝে মাঝে সাজ্জাদের সাথে দেখা করতে যায়—কোন রেস্টুরেন্টে খেতে কিংবা কোন শপিংমলে কেনাকাটা করতে কিন্তু লাবণী বুঝতে পারে সুরটুকু কেটে গিয়েছে। বাবার জন্যে ভালবাসাটুকু আছে কিন্তু তার সাথে বিচিত্র একটা বিতৃষ্ণা এসে যোগ হয়েছে। একজন মানুষকে কী একই সাথে ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যায়? দুই বছর আগে স্ত্রী-কন্যাকে ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে শারমিন অনেক চুপচাপ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তার ওপর বিচিত্র একটা বিষণ্নতা এসে ভর করে। নিজের ঘরে দিনের পর দিন চুপচাপ বসে থাকে। লাবণী কী করবে বুঝতে পারে না, বিষয়টা নিয়ে কোন রকম বাড়াবাড়ি না করে শান্তভাবে মেনে নেবার চেষ্টা করে। মেয়েটা বুদ্ধিমতী তার নিজেকেই এই অবস্থা থেকে একদিন বের হয়ে আসতে হবে।

লাবণী শারমিনের প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলল, "সে কী! পুরো শবজিটুকু রেখে দিলি মানে?"

"আমি মোটেই পুরোটুকু রাখি নি মা। তুমি আমাকে যেটুকু দিয়েছ সেটা নিয়ে এক পল্টন আর্মীও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। যতটুকু খাওয়া সম্ভব ততটুকু খেয়েছি—"

"ব্যাস। অনেক বক্তৃতা হয়েছে—খা বলছি। খেয়ে শেষ কর। মাথা ভেঙ্গে ফেলব তা না হলে।"

শারমিন মুখটা কুচকে শবজিগুলো খুটে খুটে খেতে চেষ্টা করে। লাবণী খানিকক্ষণ সেটা লক্ষ্য করে বলল, "এবারে তুই বল।"

"কী বলব?"

"তুই ভূত বিশ্বাস করিস?"

"আমি?" শারমিন চোখ কপালে তুলে বলল, "আমি ভূত বিশ্বাস করব? তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? আমাকে দেখে কী মনে হয় আমি ভূত প্রেত বিশ্বাস করি?"

"কেন ক্ষতি কী বিশ্বাস করলে?"

"আম্মু তুমি কলেজের একটা টিচার হয়ে আমাকে ভূত বিশ্বাস করতে বল?"

"আমি তোকে ভূত বিশ্বাস করতে বলছি না।"

শারমিন বলল, "তাহলে কী বলছ?"

"আমি বলছি মানুষের জীবনে একটু কল্পনা থাকতে হয়। শুধু কাঠখোট্টা মানুষের মতো যেটা সত্যি সেটা বিশ্বাস করলে হয় না—কিছু কল্পনার জিনিষও বিশ্বাস করতে হয়। আইনস্টাইন কী বলেছেন জানিস না?"

"জানি জানি আম্মু। তুমি দিনে দশবার করে মনে করিয়ে দাও না জেনে উপায় আছে!"

লাবণী বিজয়ীর মতো বলল, "তাহলে?"

"আম্মু, আইনস্টাইন মোটেও ভূত বিশ্বাস করতে বলেন নি, বলেছেন ইমাজিনেশান ইজ মোর ইম্পরট্যান্ট দ্যান নলেজ। জ্ঞান থেকে কল্পনা বেশি ইম্পরট্যান্ট।"

"একই কথা। ভূত কী আছে? নেই! তাহলে ভূতকে পাব কেমন করে? কল্পনায়। ইমাজিনেশানে। তুই জানিস পৃথিবীতে কতো ফাটাফাটি ভূতের গল্প আছে?"

শারমিন মাথা নেড়ে বলল, "তোমার যুক্তিগুলো খুবই পিকুলিয়ার। পৃথিবীতে ফাটাফাটি ভূতের গল্প আছে, সেই গল্পগুলো এনজয় করার জন্যে ভূতকে বিশ্বাস করে বসে থাকি!"

লাবণী হেসে বলল, "এই যুক্তিটি তোর কাছে পিকুইলিয়ার মনে হচ্ছে? এটা একেবার এক নম্বুরী যুক্তি!"

শারমিন বলল, "থাক আম্মু! থাক! তোমার সাথে তর্ক করার থেকে সাদিবের সাথে তর্ক করা সোজা।"

"সাদিবটা কে?"

"আমাদের সাথে পড়ে। একেবারে পাগল। শুধু পাগল না পাগল এবং ছাগল!"

লাবণী হেসে বললেন, "কেন? কী করেছে?"

"কী করে নাই বল। একেকদিন তার মাথায় একেকটা ঝোঁক আসে। তুমি বিশ্বাস করবে না মাঝখানে একবার ঠিক করল ঘাস খেয়ে থাকবে।"

"ঘাস?"

"হ্যাঁ। ঘাস। সেই ঘাস খেয়ে সিরিয়াস ডাইরিয়া, হাসপাতালে থাকতে হলো পুরা এক সপ্তাহ। সেই থেকে সবাই ডাকে ছাগল।"

"আচ্ছা পাগল দেখি।"

হ্যাঁ। এখন সে ব্ল্যাক আর্ট করে।"

"লাবণী ভুরু কুচকে বলল, "ব্ল্যাক আর্ট?"

"হ্যাঁ। আমাদেরকেও শেখাচ্ছে।"

"কী শিখাচ্ছে?"

শারমিন মাথা নেড়ে বলল, "অনেক কিছু। সবগুলো তোমাকে বলাও যাবে না। যেটা সবচেয়ে সহজ সেটা এরকম। তুমি রাত্রিবেলা বাথরুমে দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে দাঁড়াবে। বাথরুমের আলো নিভিয়ে এক কোনায় একটায় ছোট মোমবাতি জ্বালাবে যেন আবছা অন্ধকার থাকে। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাতচল্লিশবার বলবে ব্লাডি মেরী—"

লাবণী বাধা দিয়ে বলল, "সাতচল্লিশবার? সাতচল্লিশবার কেন?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না। সাদিবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেও জানে না। মনে হয় সাতচল্লিশ প্রাইম নাম্বার সেইজন্যে।"

"ভূতেরা তাহলে প্রাইম নাম্বার বুঝে?"

"মনে হয় বুঝে।"

"ঠিক আছে। সাতচল্লিশবার ব্লাডি মেরী বললাম তখন কী হবে?"

"তখন তুমি আয়নায় ব্লাডি মেরীকে দেখবে।"

"ব্লাডি মেরীটা কে?"

"একটা ডাইনী। আমেরিকাতে নাকী সালেম নামে একটা শহর আছে সেখানে তাকে পুড়িয়ে মেরেছিল।"

"কে পুড়িয়ে মেরেছিল?"

"জানিনা। মনে হয় শহরের লোকজন।"

"কবেকার ঘটনা?"

"তাও জানি না। অনেক আগেরই হবে। আজকাল কী আর কেউ কাউকে পুড়িয়ে মারে!"

লাবণী শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর সাদিব ব্লাডি মেরীকে দেখেছে?"

"এখনো ভাল করে দেখেনি। আবছা আবছা নাকি দেখেছে!"

লাবণী পানি খাচ্ছিল শারমিনের কথা শুনে হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেলো। বলল, "ব্লাডি মেরীর চেহারা কেমন?"

"চেহারা এখনো স্পষ্ট দেখে নাই। ডাইনী বুড়ীর চেহারা আবার কেমন হবে?"

লাবণী মাথা নাড়ল, বলল, "উহুঁ চেহারা ভাল হবার কথা। আমেরিকান কমবয়সী ডাইনী রীতিমতো রূপসী হয়। তোর সাদিবকে বলিস আবার প্রেমে ট্রেমে যেন পড়ে না যায়।"

এইবার শারমিন হি হি করে হাসতে লাগল। বলল, "ভালই বলেছ আপু—এটা সাদিবকে বলতে হবে। আয়নার এইপাশে সাদিব অন্যপাশে ব্লাডি মেরী। দুইজন দুইজনকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। কিন্তু একজন আরেকজনের কাছে আসতে পারবে না।"

রাত্রি বেলা ঘুমানোর আগে শারমিন বাথরুমে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে বলল"ব্লাডি মেরী," শুনে শুনে সাতচল্লিশবার। আয়নায় কিছুই হলো না। কিছু একটা হবে সেটা অবশ্যি সে আশাও করে নি! রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো তাকে পুড়িয়ে মারার জন্যে শহরের শত শত মানুষ তাকে ধাওয়া করেছে, সে কোনমতে প্রাণ নিয়ে ছুটছে। যখন তার ঘুম ভাংল তখনো তার বুক ধুক ধুক করছে, পুরো শরীর ঘামে ভেজা।

কয়দিন পর শারমিন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে, লাবণী জিজ্ঞেস করল, "তোদের ব্ল্যাক আর্টের খবর কী? পাগল সাদিবের সাথে ব্লাডি মেরীর দেখা হয়েছে?"

শারমিন দাঁত বের করে হাসল, বলল, "সাদিব এখন তার গল্প পাল্টে ফেলেছে।"

"কীভাবে পাল্টেছে?"

"এখন বলছে আসলে হঠাৎ করে বললে হবে না। সাধনা করতে হবে।"

লাবণী চোখ বড় বড় করে বলল, "সাধনা? প্রেত সাধনা?"

"হ্যাঁ। রীতিমতো প্রেত সাধনা।"

"সেটা কী রকম?"

"গরুর মাংশ ডিম এসব খাওয়া যাবে না। রসুন খাওয়া যাবে না। সাদা রংয়ের সেলাই ছাড়া কাপড় পরতে হবে। প্রতি রাত বারটার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাডি মেরীকে ডাকতে হবে, টানা সাতচল্লিশ দিন বলার পর অমাবশ্যার রাতে নাকী ব্লাডি মেরী আসবে।"

লাবণী হেসে ফেলল, বলল, "এতো পরিশ্রম করলে শুধু ব্লাডি মেরী কেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টেরও চলে আসার কথা!"

"ঠিকই বলেছ। সাদিব অবশ্যি বলছে ব্লাডি মেরী ছাড়া অন্যদেরও আনা যাবে। যার নাম বলবে সেই আসবে।"

"তাহলে তো খারাপ হয় না। ইয়াহিয়া খানকে ডেকে আনলে হয়, তারপর ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে সিধে করে দিতাম।"

"না আম্মু, ওরা খালি দেখা দিবে। আয়না থেকে বের হতে পারবে না।"

লাবণী বলল, "তাহলে আর লাভ কী। বের করে একটা বোতলের ভেতর ভর্তি করে ফেলতে পারতাম তাহলে না মজা হতো।"

শারমিন হি হি করে হেসে বলল, "সেটা ঠিকই বলেছ। বোতলে ভর্তি করে যদি ভূত বিক্রি করা যেতো কী মজা হতো তাই না?"

সেদিন রাতে ঘুমানোর আগে শারমিন বাথরুমে দাঁত ব্রাশ করছে হঠাৎ তার ব্লাডি মেরীর কথা মনে পড়ল। সে দাঁত ব্রাশ করা শেষ করে বাথরুমের লাইটটা নিভিয়ে দেয়। বাথরুমের জানালা দিয়ে বাইরের এক চিলতে

আলো ভেতরে এসে একটা আলো আঁধারির মতো হয়েছে আয়নায় নিজেকে আবছায়ার মতো দেখা যায়। শারমিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে সাতচল্লিশবার বলল "ব্লাডি মেরী"

তারপর চোখ খুলে তাকালো, আয়নায় কিছুই দেখবে না সে খুব ভাল করেই জানে তারপরও নিজের আবছা প্রতিবিম্বটা দেখে একটু আশাভঙ্গ হলো! ঠিক কী কারণ কে জানে শারমিনের মনে হচ্ছিল সে কিছু একটা দেখে ফেলবে। কী দেখবে সে জানে না—কিন্তু অলৌকিক কিছু একটা।

বাথরুমের আলো জ্বালাতে গিয়ে সে থেমে গেলো। সাদিব বলেছিল শুধু যে ব্লাডি মেরীকে ডাকা যায় তা নয় অন্য যে কোন মৃত মানুষকেও ডাকা যায়। বেচারী ব্লাডি মেরীকে নিশ্চয়ই সবাই ডাকাডাকি করছে সারা পৃথিবীর সবার কাছে তার ছোটাছোটি করতে হচ্ছে। সে তাহলে অন্য কাউকেই ডাকবে। দেখা যাক কী হয়।

শারমিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখ বন্ধ করল, হঠাৎ তার মনে হলো বাথরুমের আবছা অন্ধকারে তার সাথে অন্য কেউও আছে। জীবনে যেটা হয় নি হঠাৎ করে তার সেটা হলো, তার বুকের মাঝে ভয়ের কেমন যেন একটা কাঁপুনি স্পর্শ করে গেলো। শারমিন ফিস ফিস করে বলল, "যদি এই ঘরে আমার সাথে কোন বিদেহী আত্মা থেকে থাকো কোন অতিপ্রাকৃত প্রাণী, কোন ভূত কোন প্রেত এসে থাকো তাহলে তুমি দেখা দাও। তুমি আস—তুমি আস—তুমি আস—"

শুনে শুনে সাতচল্লিশবার বলার পর শারমিন থামলো। সে এখন চোখ খুলে তাকাবে। হঠাৎ করে তার বুকের ভেতর কেমন জানি ধ্বক করে উঠে। তার মনে হতে থাকে এই বাথরুমে তার সাথে অন্য কেউ আছে। শুধু তাই নয় তার মনে হয় সে যখন চোখ খুলে তাকাবে তখন আয়নায় সে নিজেকে দেখবে না, অন্য কাউকে দেখবে। শারমিন অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করে, মনে হতে থাকে বাথরুমটা বুঝি অসম্ভব ঠাণ্ডা, একেবারে, হিম শীতল।

শারমিন বিড় বিড় করে বলল, "না। আমি চোখ খুলে তাকাব না। আমি হাতড়ে হাতড়ে লাইটের সুইচটা বের করে আলো জ্বালিয়ে দেব। প্রচণ্ড আলোয় সব কিছু ভেসে যাবে।"

শারমিন হাতড়ে হাতড়ে লাইটের সুইচটা বের করল, সুইচটা টিপে জ্বালানোর আগের মুহূর্তে তার ঠিক কী মনে হলো কে জানে সে চোখ খুলে তাকালো। এক মুহূর্তের জন্যে সে অশরীরি একটা আতংক অনুভব করল, কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যেই চোখ খুলে সে আয়নায় নিজেকেই দেখতে পেলো, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শারমিন আবছা অন্ধকারে নিজের প্রতিবিম্বটির দিকে তাকিয়ে থাকে, এটি তার প্রতিবিম্ব কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে এখানে কিছু একটা গোলমাল

আছে। গোলমালটা কী সে ধরতে পারছে না। শারমিন ভাল করে তাকালো এবং হঠাৎ করে সে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলো। সে ডান হাতটা দিয়ে দেয়ালে লাইটের সুইচটা স্পর্শ করে আছে কিন্তু আয়নার প্রতিবিম্বে দেখা যাচ্ছে দুই হাত দুই পাশে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটা কী সত্যিই তার প্রতিবিম্ব? নাকি অন্য কারো?

শারমিন তার মাথাটি ডান থেকে বামে দোলালো—প্রতিবিম্বটি নড়ল না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শারমিন আতংকে একটা চিৎকার দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে লাইট সুইচটা টিপে দিতেই মুহূর্তে তীব্র আলোয় পুরো বাথরুমটা আলোকিত হয়ে যায়। এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর হঠাৎ করে আলো জ্বালানোর ফলে শারমিনের চোখ ধাধিয়ে যায়। সে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে আয়নার দিকে তাকালো, না আয়নায় অদ্ভূত কিছু নাই। তার নিজেকেই দেখা যাচ্ছে। চুলগুলো শক্ত করে বাঁধা, গোলাপী ফুলফুল তার ঘুমের পোষাক। দুই চোখে এক ধরণের হতচকিত বিস্ময়।

শারমিন বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিল, পুরো বিষয়টা হঠাৎ করে তার কাছে ছেলেমানুষী মনে হতে থাকে। কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সত্যি সত্যি সে ভেবে বসেছিল যে আয়নায় সে অন্য কাউকে দেখছে! সেটা কী কখনো সম্ভব?

শারমিন ট্যাপ খুলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে নিজের মুখ ভাল করে ধুয়ে নিতে শুরু করে তখন শুনতে পেলো বাইরে থেকে লাবণী ডাকছে, "কী হলো বাথরুমে ঘুমিয়ে গেলি নাকি!"

"এইতো আম্মু আসছি।"

বাথরুমে কী হয়েছিল সেটা বলার জন্যে শারমিন বের হয়ে আসে, আম্মুর সাথে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে সে হাসাহাসি করবে ভাবছিলো, কিন্তু ঠিক কী কারণ সে বুঝতে পারল না সে আম্মুকে ব্যাপারটা বলতে পারল না। লাবণী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু অবাক হয়ে বলল, কী হলো তোর চোখ মুখ এমন লাল হয়ে আছে কেন?"

শারমিন নিচু গলায় বলল, "লাল হয় নি আম্মু। চোখ মুখ কেন লাল হবে?"

"ঘুমা তাড়াতাড়ি। কতো রাত হয়েছে দেখেছিস?"

শারমিন রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। তার কেমন জানি একটু অস্থির অস্থির লাগছে। ঠিক কী কারণ সে জানে না, কিন্তু তার ভেতরে এক ধরণের চাপা ভয়। শুধু ভয় নয় এক ধরণের চাপা আশংকা। কেন জানি মনে হচ্ছে খুব অশুভ একটা কিছু ঘটেছে কিন্তু সেটা সে ধরতে পারছে না। যতবার সে ঘুমানোর চেষ্টা করছে হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, মনে

হয়েছে কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। শারমিনের একবার মনে হলো সে তার নিজের বিছানা থেকে উঠে গিয়ে লাবণীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়বে। আগে কতোবার গভীর রাতে আম্মুর পাশে জায়গা করে শুটি শুটি মেরে শুয়ে পড়েছে। আম্মু ঘুমের মাঝে জিজ্ঞেস করেছে, "কী হলো শারমিন?" শারমিন বলেছে, "ঘুম আসছে না, আম্মু", লাবণী তখন শারমিনকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। এতো বড় একটা মেয়ে হয়েও সে শুটিশুটি মেরে মায়ের বুকের মাঝে শুয়ে পড়ে প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু আজ রাতে সে তার আম্মুর কাছে গেলো না, বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল।

পরদিন ভোরবেলা লাবণী শারমিনকে দেখে ভুরু কুচকে বলল, "কী রে শারমিন তোর শরীর খারাপ নাকি?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল, "উহু।"

"তাহলে তোর এরকম চেহারা হয়েছে কেমন করে?"

"কীরকম চেহারা?":

"চোখের নিচে কালি? চোখ মুখ লাল—জ্বর উঠেছে নাকি? কাছে আয় দেখি।"

শারমিন কাছে এলো লাবণী শারমিনের হাত ধরে দেখলো গায়ে জ্বর বরং নেই, শরীরটা আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা।

শারমিন বিড়বিড় করে বলল, "বললাম তো আমার কিছু হয় নি।"

"কিছু হয় নি তাহলে তোকে দেখতে এরকম লাগছে কেন?"

"রাতে ভাল ঘুম হয় নি।"

লাবণী আরও কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করে কিন্তু শারমিন হঠাৎ চুপ করে গেলো, আর কিছু বলল না।

ইউনিভার্সিটিতে শারমিন ক্লাশে মন দিতে পারল না। তাদের ক্যালকুলাস ক্লাশ নেয় মাত্র পাশ করে আসা একজন শিক্ষক, দেখে মনে হয় বাচ্চা ছেলে। এতোগুলো ছেলে মেয়ের সামনে বেচারা একেবারে নার্ভাস হয়ে থাকে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এমন ভাবে চমকে উঠে যে দেখে সবাই হেসে কুটি কুটি হয়ে যায়। তবে বেচারা খুব পরিশ্রম করে। ইন্টিগ্রেশান বোঝানোর জন্যে রীতিমতো জান কোরবান করে ফেলে। ক্লাশের পিছন দিকে বসে কয়েকজন মিলে ক্যালকুলাস স্যারকে নিয়ে হাসি মশকরা করছিল। অন্য যে কোন দিন হলে শারমিনও তাদের সাথে যোগ দিতো কিন্তু আজকে সে চুপচাপ বসে আছে। ক্যালকুলাস স্যার কোথায় জানি ভুল করে

ফেলল এবং সেটা বের করতে গিয়ে স্যার আরো নার্ভাস হয়ে ঘামতে লাগল তখন শারমিন নিচু গলায় পাশে বসে থাকা সাদিবকে ডাকলো, "এই সাদিব।"

সাদিব মাথা এগিয়ে বলল, "কী?"

"ব্লাডি মেরী কী সত্যিই কাজ করে?"

"ধূর!" সাদিব হাত নেড়ে বলল, "এগুলো ঠাট্টা তামাশা"

"ঠাট্টা তামাশা? তাহলে তুই যে সেদিন বললি—"

সাদিব দাঁত বের করে হাসল, বলল, "ইয়ারকি মারছিলাম।"

"ইয়ারকি মেরেছিস?"

"হ্যাঁ।" সাদিব শারমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই রেগে উঠছিস কেন? তুই কী র‍্যাব কমান্ডার হয়ে গেলি নাকি যে তোর সাথে ইয়ারকী মারতে পারব না।"

"না আমি রাগি নাই। কিন্তু তুই আমার সাথে ফিউচারে ইয়ারকী মারবি না।"

সাদিব মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে। মারব না।"

ক্যালকুলাস স্যার তার ভুলটা খুঁজে পেয়েছে, খুব উৎসাহ নিয়ে সেটা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছে তাই শারমিন চুপ করে গেলো।

ক্লাশ শেষ হবার পর যখন সবাই ক্লাশরুম থেকে বের হয়ে আসছে তখন শারমিন সাদিবের সার্টের কোনা টেনে ধরল। সাদিব একটু অবাক হয়ে বলল, "সার্ট ছাড়।"

শারমিন সার্ট ছেড়ে দিয়ে বলল, "সাদিব তুই সত্যি করে বল দেখি এই যে ব্লাডি মেরী ফেরীর কথা বলেছিস এগুলো ইয়ারকী নাকি সত্যি?"

সাদিব মাথা নেড়ে বলল, "আরে বাবা আমি তো ইয়ারকীই জানি।"

"তুই কোথা থেকে এটা শুনেছিস?"

"একটা বইয়ে পড়েছি। ব্ল্যাক আর্ট ফর ইডিয়টস।" সাদিব শারমিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন? কী জন্যে জিজ্ঞেস করছিস?"

শারমিন ফিসফিস করে বলল, "আমার কাছে ব্লাডি মেরী এসেছে। ঠিক ব্লাডি মেরী না তার মতো একজন।"

সাদিব কয়েক সেকেন্ড শারমিনের দিকে তাকিয়ে থেকে ফাঁটা বাঁশের মতো শব্দ করে হা হা করে হাসতে শুরু করল। শারমিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করল, হাসিটা শেষ হওয়া মাত্রই সে সাদিবের মুখে একটা ঘুষি মারবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারতে পারল না কারণ ঠিক তখন লম্বা পা ফেলে কান্তা তার কাছে এসে হাজির হলো, বলল, "শারমিন।"

"কী হলো?"

"তোর আব্বু এসেছে।"

শারমিনের মুখটা শক্ত হয়ে যায়। ফিস ফিস করে বলল, "আব্বু না। বল তোর আম্মুর এক্স হাজবেন্ড।"

কান্তা মাথা নেড়ে বলল, "ছিঃ শারমিন এভাবে কথা বলে না। তাড়াতাড়ি যা।"

"কোথায় যাব?"

"ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।"

ক্যান্টিনের সামনে গিয়ে সাজ্জাদকে দেখে শারমিন হকচকিয়ে গেলো, দেখে মনে হচ্ছে সাজ্জাদের বয়স বুঝি দশ বৎসর কমে গেছে। মাথায় কুচকুচে কালো চুল, চোখে দামী সান গ্লাস পরনে একটু রংচংয়ে টি সার্ট, রং ওঠা জিনসের প্যান্ট এবং পায়ে ক্যাডস। শারমিনকে দেখে সাজ্জাদ সান গ্লাসটা খুলে একটু হাসলো, বলল, "কী রে বেটি! ভাল আছিস?"

যখন তার আব্বু সামনে থাকে না তখন শারমিন তার উপর ভয়ংকর রেগে থাকে, কিন্তু যখন সামনা সামনি থাকে তখন সে রেগে থাকতে পারে না। শারমিন চেষ্টা করেও মুখটা কঠিন রাখতে পারল না, হাসি হাসি মুখে বলল, "আব্বু, তোমার বয়স দেখি দশ বৎসর কমে গেছে।"

সাজ্জাদ চুলের ভেতর দিয়ে আঙুলগুলো টেনে নিয়ে বলল, "চুলগুলি ডাই করে ফেললাম। কেমন হয়েছে।"

"ভাল। তোমাকে হ্যান্ডসাম লাগছে।"

"আর হ্যান্ডসাম!" সাজ্জাদ হাসার চেষ্টা করল, "তুই কী ব্যস্ত? ক্লাশ আছে নাকি?"

শারমিনের একটা ক্লাশ ছিল কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। বলল, "নাহ! নেই।"

"চল তাহলে লাঞ্চ করি। যাবি কোথাও?"

"কাছাকাছি কোথাও হলে যেতে পারি।"

"আয়। এই কাছেই একটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে।"

ছোট একটা টেবিলে দুজন সামনা সামনি বসে। কোল্ড ড্রিংকে চুমক দিয়ে সাজ্জাদ বলল, "তোর আম্মু কেমন আছে?"

"ভাল।" বলবে না বলবে না করেও জিজ্ঞেস করে ফেলল, "তোমার ওয়াইফ কেমন আছে?"

সাজ্জাদ চোখ তুলে মেয়ের দিকে এক নজর তাকিয়ে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "ভাল।"

ঠিক তখন শারমিন লক্ষ করল সাজ্জাদের ডান গালে একটা আচড়ের দাগ, প্রায় চোখ পর্যন্ত চলে গেছে। এ জন্যে কী কালো সানগ্লাস পরে আছে? প্রায় না বুঝেই সে হাত দিয়ে সাজ্জাদের গালে হাত দিয়ে বলল, "আব্বু তোমার মুখে কী হয়েছে?"

সাজ্জাদ মেয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, "কিছু না।"

শারমিন কিছুক্ষণ সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "আব্বু। আর ইউ হ্যাপি?"

সাজ্জাদ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "তোর আম্মুকে তো আমি কোন টাকা পয়সা দিতে পারি না। আমার থেকে কিছু নেবে না।"

"তোমার এতোদিনের ওয়াইফ ছিল। তোমার থেকে ভাল করে আর কে আম্মুকে চিনবে?"

সাজ্জাদ আরেকটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষ চেনা এতো সহজ নয় শারমিন। সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও একজন আরেকজনকে চিনতে পারে না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মানুষ নিজেই নিজেকে চিনতে পারে না—আর অন্যকে!"

শারমিন কোন কথা না বলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। লাবণীকে ডির্ভোস করে নীলাকে বিয়ে করে মানুষটা মনে হয় সুখী হতে পারে নি। সুখ জিনিষটা মনে হয় খুব সহজ জিনিষ নয় ধরা দিতে গিয়েও ধরা দেয় না।

সাজ্জাদ হঠাৎ করে শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "শারমিন, তোর মা তো আমার কোন টাকা পয়সা নিতে চাচ্ছে না। তুই নিবি?"

"আমি?" শারমিন একটু অবাক হয়ে সাজ্জাদের দিকে তাকালো।

"হ্যাঁ। তুই। আমি লেখা পড়া করে দিয়ে যাই?"

"দিয়ে কোথায় যাবে?"

"না। যাব আর কোথায়! এটা একটা কথার কথা। যদি হঠাৎ মরে টরে যাই।"

শারমিন শব্দ করে হাসল। বলল, "আব্বু, যত দিন যাচ্ছে তত তোমার বয়স কমছে। তুমি এখন মরে টরে যাবে কেন?"

"এগুলো বাইরের ব্যাপার।" সাজ্জাদ দুর্বলভাবে হাসে, বলে, "ভেতরে ভেতরে আমি আসলে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।"

"এভাবে বল না শুনতে ভাল লাগে না।"

"ঠিক আছে বলব না।" সাজ্জাদ সোজা হয়ে বসে বলল, "তোর আম্মু রাগ হোক আর যাই হোক আমি আমার প্রপার্টি ভাগাভাগি করে দিয়ে যেতে চাই। তুই আমার মেয়ে, তোকে না দিলে কাকে দিব? তুই তোর আম্মুর সাথে কথা বলিস।"

শারমিন বলল, "বলব আব্বু।"

সাজ্জাদ অন্যমনস্ক ভাবে তার গালে হাত বুলায়, একটা খামচির দাগ তার গাল থেকে উঠে চোখ পর্যন্ত গিয়েছে। নীলা কি খামচি দিয়ে তার চোখটা তুলে নিতে চাইছে? শারমিন ভেতর ভেতরে একটু শিউরে উঠে, কী সর্বনাশ!

রাত্রি বেলা শারমিন হঠাৎ এক ধরণের অস্থিরতা অনুভব করে। যতই রাত হতে থাকে ততই তার অস্থিরতা বাড়তে থাকে। অস্থিরতাটুকু কী নিয়ে সে বুঝতে পারছিল না, কিন্তু ঘুমানোর আগে সে দাঁত ব্রাশ করার জন্যে বাথরুমে গিয়েই অস্থিরতার কারণটুকু বুঝতে পারে। সে আবার বাথরুমে আবছা অন্ধকারে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গতরাতের মতো প্রেতাত্মাকে ডাকতে চায়। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তার ভেতরে এক ধরণের অশুভ আশংকা কাজ করছে কিন্তু একই সাথে তার জন্যে এক ধরণের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। যারা ড্রাগস খায় তারা মনে হয় তাদের ড্রাগসের জন্য এরকম একধরণের আকর্ষণ অনুভব করে।

শারমিন নিঃশব্দে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে লাইট নিভিয়ে দিলো। জানালা দিয়ে এক চিলতে আলো এসে অন্ধকার বাথরুমে একটা আবছা আলো আঁধারির জন্ম দিয়েছে। শারমিন আয়নায় নিজেকে দেখতে পায়, হাত নাড়ালে তার প্রতিবিম্বটুকু হাত নাড়ছে, মাথা ঝাকালে প্রতিবিম্বটুকু মাথা ঝাকাচ্ছে। শারমিন চোখ বন্ধ করে হাত দুটি বুকের কাছে নিয়ে এসে মাথা নিচু করে ফিস ফিস করে বলল, "হে বিদেহী আত্মা, হে পরাজগতের বাসিন্দা, হে অতিপ্রাকৃত প্রাণী তুমি কে আমি জানি না, শুধু জানি তুমি আমাকে দেখা দাও। তুমি এসো। আমি তোমাকে আহ্বান করছি। এসো তুমি এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

বিড়বিড় করে কথাগুলো বলতে বলতে শারমিন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেলো। তার মনে হতে থাকে সে এক গভীর অন্ধকার জগতে তলিয়ে যাচ্ছে। মনে হতে থাকে সে বুঝি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, সে বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তখন সে চোখ খুলে তাকালো এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। বাথরুমের চতুষ্কোন বড় আয়নাটি থেকে হালকা একটা নীল আলো বের হচ্ছে। সেখানে আবছা কুয়াশার মতো এবং সেই কুয়াশার ভেতর থেকে আবছায়ার মতো একটা মূর্ত্তি স্পষ্ট হয়ে আসছে। মূর্ত্তিটি খুব ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো। শীর্ণ মুখ, কোটরের মাঝে ঢুকে থাকা দুটি চোখ, মুখে বয়সের বলি রেখা। মূর্ত্তিটি ফিস ফিস করে বলল, "আমি এসেছি। আমাকে বের হতে দাও—"

শারমিন একটা চিৎকার করে লাইটের সুইচটার উপর ঝাপিয়ে পড়ে আলো জ্বেলে দেয়। মূহুর্তে পুরো বাথরুমটা তীব্র আলোতে ভেসে গেলো। কিন্তু শারমিন সেটা দেখতে পেল না। সে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চিৎকার করতে থাকে।

লাবণী বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ছিটকিনি ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে আবিষ্কার করল শারমিন বাথরুমের মেঝেতে গুটিশুটি মেরে বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপছে।

লাবণী ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে শারমিন? কী হয়েছে?"

শারমিন কোন কথা বলতে পারে না, ভয় পাওয়া গলায় গোঙ্গানোর মত শব্দ করতে থাকে। লাবণী তাকে ধরে বাথরুম থেকে বের করে আনে, তখনো সে থরথর করে কাঁপছে। লাবণী শারমিনকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কী হয়েছে শারমিন? কথা বল।"

শারমিন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সে এসেছে আম্মু। সে এসেছে।"

"কে এসেছে?"

"আমি যাকে ডেকেছিলাম।"

"তুই কাকে ডেকেছিলি?"

"আমি জানি না, আম্মু—সে এসেছে। সে বের হতে চাইছে।"

লাবণী কিছু বুঝতে পারছিল না, জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে বের হতে চাইছে?"

লাবণী অপ্রকৃতস্থের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আয়নার ভেতর থেকে।"

হঠাৎ করে লাবণীর কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ব্লাডি মেরীকে ডেকেছিস?"

শারমিন মাথা নাড়ল, "না আম্মু। ব্লাডি মেরী না। অন্য কেউ।"

"সে কে? দেখতে কেমন?"

শারমিন চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস করো না আম্মু। আমার ভয় করে। আমার অনেক ভয় করে।"

সে রাতে লাবণী শারমিনকে নিজের বিছানায় নিয়ে ঘুমালো। সারারাত সে শারমিনকে শক্ত করে ধরে রাখল। শারমিন ঘুমের মাঝে ছটফট করে, অস্ফুট গলায় কথা বলে—লাবণী তার কোনো কথা বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে দেখে তার ঘরটা আশ্চর্য রকম শীতল। শুধু শীতল নয় ঘরে বিচিত্র এক ধরণের গন্ধ, পুরানো মাটির গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ। লাবণীর বিশ্বাস হতে চায় না কিন্তু তার মনে হয় এই ঘরে অন্য কেউ আছে, যে ফিস

ফিস করে কথা বলছে, কথাগুলোও যেন বোঝা যায়, মনে হয় যেন বলছে, "আমি এসেছি! আমি এসেছি।"

লাবণী সারারাত শারমিনকে বুকে ধরে রেখে জেগে বসে রইল।

পরদিন শারমিন ঘুম থেকে উঠল বেশ দেরী করে। নাস্তার টেবিলে লাবণী নিজে থেকে গতরাতের বিষয়টা তুলতে চাইছিল না কিন্তু শারমিন কিছু বলতে চাইছে না দেখে শেষ পর্যন্ত লাবণীকে তুলতেই হলো। খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছে এরকম ভান করে বলল, "কাল রাতে কী পাগলামো করলি বলবি একটু?"

শারমিন একটু লজ্জা পেয়ে যায়। বলল, "না, আম্মু। বলব না।"

"না বললে হবে কেমন করে। বল শুনি।"

"বলতে লজ্জা করছে আম্মু।"

"লজ্জা করলে হবে না। বল শুনি।"

শারমিন তখন পুরো ঘটনাটা খুলে বলল। শুনে লাবণী কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলো। চিন্তিত মুখে বলল, দেখ শারমিন আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না ভূত প্রেত বলে কিছু আছে। কিন্তু তুই যেটা বললি সেটার সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে সত্যিই কোন ভৌতিক প্রাণী এসেছিল—"

শারমিন শুকনো মুখে বলল, "কিন্তু আম্মু তুমি যদি দেখতে তাহলে বুঝতে—"

"আমার দেখার কোন শখ নেই। জ্যান্ত মানুষের যন্ত্রণাতেই বাঁচি না। এখন যদি ভূতের যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয় তাহলে তো মুশকিল।" লাবণী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "তবে একটা জিনিষ তোকে বলে রাখি।"

"কী জিনিষ?"

"বাথরুমে গিয়ে অন্ধকারে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভূত প্রেত ব্লাডি মেরীকে ডাকডাকি বন্ধ। বুঝেছিস?'

শারমিন মাথা নাড়ল, "বুঝেছি।"

"তুই সত্যিই ভূত প্রেত ডেকে আনিস আমি সেটা বিশ্বাস করি না কিন্তু সেলফ হিপনোটাইজের মতো কিছু একটা হয়ে তুই যে আজগুবি জিনিষ কল্পনা করতে শুরু করিস সেটা নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

শারমিন আবার বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে আম্মু।"

লাবণী মুখ শক্ত করে বলল, "ইন ফ্যাক্ট আগামী কয়েকদিন তোকে আমি একা বাথরুমেই যেতে দেব না।"

শারমিন চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বলছ তুমি আম্মু?"

"আমি ঠিকই বলছি। তুই গতরাতে যেভাবে ভয় পেয়েছিস সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার না। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

লাবণীর হঠাৎ গত রাতের কথা মনে পড়ে যায়। কনকনে ঠাণ্ডা ঘরে পচা ভেজা মাটির এবং শ্যাওলার মতো এক ধরণের গন্ধ, বিচিত্র এক ধরণের ফিস ফিস শব্দ, মনে হচ্ছে কেউ একজন নিঃশব্দে ঘরের মাঝে হাঁটছে, তার মাঝে সারারাত সে শারমিনকে বুকে চেপে ধরে জেগে বসে আছে।

শারমিন আবার জিজ্ঞেস করল, "তা ছাড়া কী আম্মু?"

লাবণী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "না, কিছু না।"

বিকেলে লাবণী একটা বইয়ের প্যাকেট নিয়ে বাসায় ঢুকলো। শারমিন জিজ্ঞেস করল, "কী বই কিনেছ আম্মু?"

লাবণী একটা ইতস্তত করে বলল, "বই কী কেনার উপায় আছে নাকি! বইয়ের কী দাম জানিস?"

"তবুও তো কিনে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ। কিনলাম, ব্ল্যাক আর্টের উপর দুইটা। আরেকটা প্রেত চর্চার উপর ইন্ডিয়ান বই।"

শারমিন হেসে ফেলল, বলল, "কী আশ্চর্য; আমিও আজকেই সাদিবের কাছ থেকে তার ব্ল্যাক আর্টের বই গুলো নিয়ে এসেছি!"

"দেখি তোর বইগুলো!"

দুজনই তখন তাদের বইগুলো নিয়ে আসে। টেবিলে রেখে ওলট পালট করে দেখে। লাবণী অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "কী আশ্চর্য একটা ব্যাপার! এরকম উদ্ভট একটা বিষয়ের উপর কতোগুলো মানুষ কতোগুলো বই লিখে ফেলেছে দেখেছিস?"

শারমিন বলল, "এখন তুমি এটাকে উদ্ভট বলছ কেন? কয়দিন আগেই না তুমি আমাকে বোঝাচ্ছিলে এগুলো বিশ্বাস করলে আইনস্টাইন হওয়া যায়।"

লাবণী রেগে গিয়ে বলল, "ফাজলেমী করবি না। আমি মোটেও সেটা বলিনি।"

সন্ধ্যেবেলা দেখা গেলো সোফায় হেলান দিয়ে দুজনেই খুব মনোযোগ দিয়ে ব্ল্যাক আর্টের উপর বই পড়ছে। রাত্রি বেলা অবস্থার একটু পরিবর্তন হলো। হঠাৎ করে দেখা গেলো শারমিনের ভেতর একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। তার চোখ মুখ কেমন যেন লালচে হয়ে গেলো এবং সে হঠাৎ

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। দেখে মনে হচ্ছে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। লাবণী একটু অবাক হয়ে বলল, "তোর কী হয়েছে? শারমিন, তুই এরকম ছটফট করছিস কেন?"

শারমিন উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে বলল, "জানি না আম্মু। কেমন যেন অস্থির লাগছে।"

"অস্থির লাগছে মানে কী?"

"মানে ঠিক জানি না। শুধু মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে—"

"শুধু—কী মনে হচ্ছে?"

শারমিন মাথায় চুলগুলির ভেতর আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে বলল, "মনে হচ্ছে কিছু একটা করতে হবে—"

লাবণী তীক্ষ্ণ চোখে শারমিনের দিকে তাকিয়ে থেকে শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী করতে হবে?"

"একজনকে ডাকতে হবে।"

লাবণী কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর জিজ্ঞেস করল, "আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে ডাকতে চাস?"

শারমিনের মুখে অপরাধবোধের একটা ছাপ পড়ল। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, আম্মু।"

লাবণী উঠে গিয়ে শারমিনের হাত ধরে টেনে এনে সোফায় তার নিজের পাশে বসালো, মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমি জানি না তোর কী হয়েছে শারমিন। তবে যেটাই হয়ে থাক সেটা থেকে তোর বের হয়ে আসতে হবে। বুঝেছিস?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ বুঝেছি।"

"আজ সারারাত আমি তোর সাথে থাকব। তোকে আমি এক সেকেন্ডের জন্যে ছাড়ব না। বাথরুমে গেলেও না।

শারমিন দুর্বলভাবে একটু হাসার চেষ্টা করল। লাবণী দেখল তার ঠোঁটগুলো কেমন যেন কালচে দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে এবং সেখান থেকে জ্বলজ্বল করছে। চুলগুলো এলোমেলো এবং চেহারার মাঝে এক ধরণের অপ্রকৃতস্থ ভাব। লাবণী শারমিনের হাত ধরে বলল, "আয় ঘুমাবি।"

শারমিন বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে না আম্মু।"

"ঘুম না পেলেও ঘুমাতে হবে। তোকে একটা সিডেটিভ দিয়ে দিই, খেয়ে মড়ার মতো ঘুমাবি।"

শারমিন আপত্তি করল না। একটা সিডেটিভ খেয়ে লাবণীর বিছানায় লাবণীর পাশে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করে শারমিন এক

সময় শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। লাবণী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, যখন দেখল শারমিনের নিঃশ্বাস ঘুমন্ত মানুষের মতো নিয়মিত ভাবে পড়ছে তখন সে বিছানা থেকে উঠে বাসার সব কয়টা বাথরুমের দরজায় তালা মেরে দিল। রাত্রে ঘুমের মাঝে উঠেও শারমিন যেন গিয়ে নূতন কোন পাগলামী করে ফেলতে না পারে। লাবণী তার বইগুলো নিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসে। এক হাতে শারমিনকে ধরে রেখে অন্য হাত দিয়ে বইটা কোলের উপর রেখে পড়তে শুরু করে। ব্ল্যাক আর্ট, শয়তানের উপাসনা এবং প্রেত চর্চা নিয়ে যে পৃথিবীতে এতো কিছু ঘটে গেছে সেটা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। বইয়ে এমন ভাবে লেখা আছে যেন সত্যিই পৃথিবীতে অলৌকিক জিনিষ আছে, যেন সত্যিই ভূত প্রেত আছে, তারা মানুষের কাছে আসতে পারে, মানুষকে বশ করতে পারে। বইগুলো পড়তে পড়তে লাবণী এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

গভীর রাতে শারমিন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। লাবণী বলেছিল তাকে যে সিডেটিভ খাওয়ানো হয়েছে আগামীকাল ভোরের আগে তার ঘুম ভাংবে না, কিন্তু তার ঘুম ভেঙ্গে গেল কেন সে বুঝতে পারল না। শারমিনের মনে হলো তাকে কেউ ডেকেছে—কিন্তু কে ডাকতে পারে? তার আম্মু এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে, বুকের উপর একটা বই। শারমিন তার শরীর থেকে লাবণীর হাতটা সরিয়ে উঠে বসল। তাকে কিছু একটা করতে হবে কিন্তু সেটা কী সে মনে করতে পারল না। কেউ একজন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে তার ডাকতে হবে, পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত ভয়ংকর। অত্যন্ত অশুভ কিন্তু তার কিছু করার নেই। তাকে যেতেই হবে। শারমিন সাবধানে বিছানা থেকে নেমে এলো, তার আম্মু ঘুমাচ্ছে কিছু টের পেল না।

শারমিন বাথরুমের দরজায় হাত দিয়ে দেখে সেটা তালা মেরে বন্ধ করে রাখা। হঠাৎ করে সে নিজের ভেতরে এক ধরণের ক্রোধ অনুভব করে, অত্যন্ত বিচিত্র এক ধরণের বিজাতীয় ক্রোধ। ক্রোধটা করে উপরে সে বুঝতে পারে না, কিন্তু তার হঠাৎ করে সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে করে, তার মনে হতে থাকে ইচ্ছে করলেই সে বুঝি সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে পারবে। শারমিন তখনই শোয়ার ঘরে ফিরে আসে। তার আম্মু বিছানায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, বুকের উপর একটা বই খোলা। শারমিন মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই ড্রেসিং টেবিলটা চোখে পড়ল, সেখানে একটা বড় আয়না। হঠাৎ শারমিনের চোখ গুলো চকচক করে উঠে, সে পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালো, কী আশ্চর্য! তাকে

দেখতে একটা অপরিচিত মেয়ের মতো মনে হচ্ছে। সে স্থির দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকায়।

ঠিক তার কানের কাছে ফিস ফিস করে কে যেন বলল, "আমি এসেছি! আমি এসেছি।"

শারমিনের হঠাৎ মনে হলো ঘরের ভেতর একটা দমকা বাতাস তাকে ঝাপটা দিয়ে গেলো, হিমশীতল বাতাসে তার সারা শরীর কেঁপে উঠে। কিছু একটা ঘটবে এখন, কী ঘটবে সে বুঝতে পারছে না। শারমিন আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং হঠাৎ করে দেখে তার চুলগুলো ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে উঠছে। মুখের চামড়ায় বয়সের বলিরেখা দেখা দেয়, চোখগুলো কুটুরীতে ঢুকে গিয়ে সেগুলো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতে শুরু করে। শারমিন দেখলো গোলাপী ফুল ফুল ঘুমের পোষাকে ছোপ ছোপ রক্তের ছাপ পড়েছে। শারমিন তার হাতটা ওপরে তুললো—আয়নায় দেখা যায় সেটি কংকালসার শীর্ণ হাত সেখান থেকে নখ বাঁকা হয়ে বের হয়ে আছে। শারমিন স্থির চোখে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটগুলো ঝুলে পড়ছে, ধারালো দাঁত বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। দাঁতের ফাঁক থেকে একটা লাল লকলকে জিব উঁকি দিয়ে উঠে। চাপা একটু দুর্গন্ধ শারমিনের নাকে ভক করে এসে ধাক্কা দেয়, পচা মাংশের সেই দুর্গন্ধে হঠাৎ করে শারমিনের সারা শরীর গুলিয়ে উঠে।

আয়নার সেই ভয়ংকর ছায়ামূর্ত্তি শারমিনের দিকে তাকিয়ে হাসলো, সেই ভয়ংকর হাসি দেখে শারমিনের সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠে। সে ভয়ংকর আতংকে সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, খুব ধীরে ধীরে সে আয়নার ভেতর থেকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, ঠিক আয়নার সামনে এসে আর বের হতে পারে না। তখন সে ফিস ফিস করে শারমিনকে ডাকে, খসখসে চাপা গলায় বলল, "আমি এসেছি! আমাকে বের হতে দাও।"

শারমিন ভয়ানক আতংকে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু তার পা মনে হয় মেঝেতে গেথে গেছে সে এখান থেকে নড়তে পারছে না, অবর্ণনীয় একটা আতংকে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। ছায়ামূর্ত্তিটি আবার শারমিনকে ডাকে, "কাছে এসো! আমাকে স্পর্শ করো। আমাকে বের হতে দাও।"

শারমিনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে সেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আছে।

শারমিনের মুখ হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠে, তার চোখ ফেটে পানি বের হয়ে আসে। ছায়ামূর্ত্তিটি ফিস ফিস করে তাকে ডাকে, "এসো। এসো আমার কাছে। আমাকে ছোও—মাত্র একটি বার—"

শারমিন কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে যায়। হঠাৎ করে সে বুঝতে পারে তার কিছুতেই আয়নাটি স্পর্শ করা উচিৎ না। স্পর্শ করলেই খুব ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবে। কিন্তু সে বুঝতে পারে তাকে আয়নাটা স্পর্শ করতেই হবে। অসহায়ের মতো সে হাত তুলে আয়নাটা স্পর্শ করে সাথে সাথে হঠাৎ পুরো আয়নাটা চূর্নবিচূর্ণ হয়ে যায়। বিস্ফারিত চোখে শারমিন দেখলো আয়নার ভেতর থেকে কুৎসিত একটা প্রাণী বের হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শারমিন চিৎকার করে নিচে পড়ে যায়, তার বুকের ওপর বসে সেই কুৎসিত প্রাণীটি তার লাল জিব বের করে শারমিনের মুখের দিকে এগিয়ে আসে, ধারালো দাঁত বসিয়ে দেয় তার কাঁধে। ভয়ংকর আতংকে শারমিন চিৎকার করতে থাকে কিছুতেই সে আর থামতে পারে না। মনে হয় চিৎকারে তার গলার মাংশপেশী ছিড়ে গলগল করে রক্ত বের হয়ে যাবে কিন্তু তবুও সে থামতে পারে না!

শারমিনের চিৎকার শুনে লাবণী লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠলো, বিস্ফারিত চোখে দেখলো শারমিন মেঝেতে শুয়ে দুই হাতে অদৃশ্য কোন একটা প্রাণীকে তার বুকের উপর থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করছে। সারা ঘর ভাঙ্গা আয়নার কাঁচ, সেই কাঁচের আঘাতে শারমিনের হাত পা মুখ কেটে গেছে, সেখান থেকে রক্ত ঝরে দেখতে দেখতে তার ঘুমের কাপড়ে ছোপ ছোপ লাল রং লেগে যাচ্ছে।

লাবণী ছুটে এসে শারমিনের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নেয়, চিৎকার করে ডাকতে থাকে, "শারমিন, এই শারমিন।"

শারমিনের শরীর থর থর করে কাঁপছে, তার মাঝে সে চোখ খুলে লাবণীর দিকে তাকালো, অপ্রকৃতস্থ সেই চোখের দৃষ্টি দেখে হঠাৎ লাবণীর বুক কেঁপে উঠে। ভয় পাওয়া গলায় সে আবার ডাকল "শারমিন।"

শারমিনের মুখটা অল্প একটু খুলে যায়, সে ফিস ফিস করে স্পষ্ট গলায় বলল, "আমি শারমিন না।"

লাবণী ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তুমি কে?"

শারমিন তীব্র দৃষ্টিতে লাবণীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কাফ্রীদা।" তারপর অমানুষিক গলায় খলখল করে হাসতে শুরু করল।

সেই হাসির শব্দ শুনে হঠাৎ করে লাবণীর সমস্ত শরীর শীতল হয়ে যায়।

টেলিফোনের শব্দে সাজ্জাদের ঘুম ভেঙে যায়। সে বালিশের নিচে থেকে তার ঘড়ি বের করে সময় দেখলো, রাত একটা তিরিশ মিনিট। এতো রাতে তাকে কে ফোন করবে?

পাশে শুয়ে থাকা নীলা ঘুমঘুম গলায় বলল, "ফোনটা ধরো না, প্লীজ।"

সাজ্জাদ বিছানা থেকে নেমে বাইরের ঘরে গিয়ে ফোন ধরল, বলল, "হ্যালো।"

অন্যপাশ থেকে একটা নারী কণ্ঠ শুনতে পায়, "সাজ্জাদ?"

"হ্যাঁ, সাজ্জাদ কথা বলছি।"

"আমি লাবণী।"

সাজ্জাদ সাথে সাথে সোজা হয়ে বসে। তার নীলার সাথে একটা সম্পর্ক আছে জানার পর থেকে লাবণী একটি বারও তার সাথে কথা বলে নি। আজ এই প্রথমবার। এই গভীর রাতে। হঠাৎ একটা অজানা আশংকায় সাজ্জাদের বুক কেঁপে উঠে। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে লাবণী?"

"শারমিনের খুব বড় বিপদ। তুমি একটু আসবে?"

"কী হয়েছে শারমিনের?"

টেলিফোনের অন্যপাশে লাবণী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "আমি জানি না। হিস্টিরিয়ার মতো অবস্থা, ড্রেসিং টেবিলের আয়না ভেঙ্গে সারা শরীর কেটে কুটে গেছে কিন্তু সেটা ইম্পরট্যান্ট না।"

"তাহলে কোনটা ইম্পরট্যান্ট।"

"তাকে ধরে বেধে রাখা যাচ্ছে না। চিৎকার করছে ছটফট করছে আর বলছে—" লাবণী হঠাৎ থেমে গেলো।

"সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল, কী বলছে?"

"বলছে সে শারমিন না। সে অন্য কেউ।"

সাজ্জাদ কয়েক মূহুর্ত চুপ করে রইল। মাত্র গতকাল শারমিনকে নিয়ে সে ফাস্টফুডের দোকানে গিয়েছে, এক সাথে খেয়েছে, গল্প করেছে। হঠাৎ করে তার বুকের ভেতরটা কেমন জানি ওলট পালট হয়ে যায়। শারমিন! তার আদরের শারমিনের কী হয়েছে এটা? সাজ্জাদ বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "লাবণী। আমি আসছি। আমি এক্ষুনি আসছি।"

"থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ।" হঠাৎ লাবণীর গলা ভেঙ্গে যায়, "আমার খুব ভয় করছে।"

সাজ্জাদ যখন বেডরুমে ফিরে এলো তখন বিছানা থেকে নীলা ঘুম ঘুম গলায় বলল, "কে ছিল?"

"লাবণী।"

নীলার কয়েক মূহুর্ত লাগল বুঝতে লাবণী মানুষটা কে। যখন বুঝতে পারল তখন সে প্রায় লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল। তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, "লাবণী?'

"হ্যাঁ।"

"এতো রাতে? এতো রাতে কেন ফোন করেছে?"

"শারমিনের কিছু একটা হয়েছে।"

"কী হয়েছে?"

"ঠিক বুঝতে পারছে না।"

"বুঝতে না পারলে তোমাকে ফোন করেছে কেন? হাসপাতালে নিয়ে যায় না কেন?"

সাজ্জাদ নীলার দিকে তাকিয়ে রইল, হঠাৎ করে তার কথা বলার ইচ্ছে করল না। সে স্টীলের আলমারী খুলে একটা প্যান্ট বের করে। নীলা হঠাৎ করে যেন খেপে যায়, চিৎকার করে বলল, "তুমি কী করছ?"

"কাপড় পরছি।"

"কেন?"

"শারমিনকে দেখতে যাব।"

"এতো রাতে?"

"হ্যাঁ।"

"এতো রাতে কেন যেতে হবে? কাল সকালে কেন যাও না?"

সাজ্জাদ শান্ত গলায় বলল, "কারণ বিপদটা কাল সকালে হয় নি। বিপদটা হয়েছে এখন। এতো রাতে।"

"এতো রাতে ড্রাইভার নেই, তুমি কেমন করে যাবে?"

"আমি ড্রাইভিং জানি। আমার ড্রাইভারস লাইসেন্স আছে।"

নীলা হঠাৎ মশারী থেকে বের হয়ে এলো, তাকে কেমন যেন খ্যাপা একটা বাঘিনীর মতো দেখাচ্ছে, সে হিংস্র গলায় বলল, "তুমি এখন যেতে পারবে না।"

সাজ্জাদ খানিকটা অবাক এবং অনেকখানি ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "আমি এখন যেতে পারব না?"

"না। আমাকে একা রেখে তুমি যেতে পারবে না।"

"একা রেখে? বাসায় দুইজন কাজের মানুষ—গেটে দারোয়ান—"

"আই ডোন্ট কেয়ার। তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে কী মাঝ রাতে এক্স-ওয়াইফের কাছে যাবার জন্যে?"

সাজ্জাদ অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, "আমি মাঝ রাতে আমার এক্স ওয়াইফের কাছে যাচ্ছি না, আমি আমার অসুস্থ মেয়ের কাছে যাচ্ছি।"

"তোমার মেয়ে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলো? আর সাথে সাথে তোমার ওয়াইফ তোমাকে ফোন করল? এতো প্রেম কবে থেকে হয়েছে?"

সাজ্জাদ শীতল চোখে বলল, "দেখো নীলা, তুমি এভাবে কথা বলবে না।"

নীলা হুংকার দিয়ে বলল, "কী? তোমার এতো বড় সাহস? তুমি আমার সাথে চোখ রাঙিয়ে কথা বল?"

"আমি তোমার সাথে চোখ রাঙিয়ে কথা বলি নি। আমি তোমাকে বলছি যে আমার মেয়ে অসুস্থ—"

"তোমার মেয়েই তোমার সব? দিন নেই রাত নেই শুধু মেয়ে মেয়ে মেয়ে—আমি কী বানের জলে ভেসে এসেছি?"

সাজ্জাদ বুঝতে পারল নীলার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। যত দিন যাচ্ছে এই মেয়েটি যেন ততই অবুঝ এবং মেজাজী হয়ে উঠছে। ছোট একটা বিষয়কে ফুলিয়ে ফাপিয়ে একটা বিশাল ব্যাপারে পাল্টে দেয়, মাঝে মাঝে সাজ্জাদের কাছে অসহ্য মনে হয়। সে নীলার সাথে কথা বলার চেষ্টা করল না, তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিয়ে মানিব্যাগ আর গাড়ির চাবি নিয়ে বের হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। সারাক্ষণ নীলা রাগে ফুসঁছে এবং অর্থহীন কথা বলছে, ঠিক যখন সাজ্জাদ দরজা খুলে বের হবে তখন খপ করে তার বুকের কাপড় খামচে ধরে চিৎকার করে বলল, "না, তুমি যেতে পারবে না।"

সাজ্জাদ থমথমে গলায় বলল, "কাপড় ছাড় নীলা।"

নীলা চিৎকার করে বলল, "ছাড়ব না আমি ছাড়ব না। তুমি কী করবে?"

হঠাৎ সাজ্জাদের মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে শক্তহাতে নীলার হাত ধরে নিজেকে মুক্ত করে একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। তাল সামলাতে না পেরে নীলা বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেখান থেকে ঝট করে উঠে বসে হিংস্র চোখে সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছ? তুমি জান আমি প্রেগনেন্ট? তুমি জান আমার পেটে বাচ্চা?"

সাজ্জাদ একেবারে হকচকিয়ে গেলো। অবাক হয়ে বলল, "তুমি প্রেগনেন্ট?"

"হ্যাঁ। তুমি তোমার প্রেগনেন্ট বউয়ের গায়ে হাত তুলেছ।"

"তুমি প্রেগনেন্ট সেটা আমাকে কখনো বল নি কেন?"

নীলা চিৎকার করে বলল, "আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছ, দিয়েছ সুযোগ?"

"সুযোগ?" সাজ্জাদ অবাক হয়ে নীলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে নীলা। আমি এটা নিয়ে তোমার সাথে পরে কথা বলব। এখন আমি যাই—আমার মেয়ে অসুস্থ—"

নীলা চিৎকার করে বলল, "তোমার অসুস্থ মেয়ে যেন কোনদিন সুস্থ না হয়। সে যেন মুখে রক্ত উঠে মারা যায়।"

সাজ্জাদের মাথার মাঝে একটা বিস্ফোরণ হল, তার মনে হলো সে গিয়ে নীলার টুটি চেপে ধরবে, কিন্তু সে কিছু করল না, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

লাবণী দরজা খুলে একটু সরে দাঁড়ায়—সাজ্জাদ ভেতরে ঢুকে লাবণীর দিকে তাকাল। গত দুই বৎসর এই প্রথম তারা একজন আরেকজনের সামনা সামনি দাঁড়িয়েছে, অন্য যে কোন সময় হলে এরকম একটি মূহুর্ত হতো অত্যন্ত অস্বস্তিকর মূহুর্ত, কে কী নিয়ে কথা বলবে তারা বুঝতে পারতো না। কিন্তু এখন সেরকম কিছু হলো না। সাজ্জাদ শুকনো গলায় বলল, "কেমন আছে শারমিন?"

"আগের মতো। ভয়ানক চেচামেচি করছে। দেখে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে।" হঠাৎ করে লাবণীর গলা ভেঙ্গে যায়, কাতর গলায় বলল, "আমার খুব ভয় করছে সাজ্জাদ।"

সাজ্জাদ লাবণীর পিঠে হাত রেখে বলল, "ভয় কী লাবণী। সব ঠিক হয়ে যাবে। কী হয়েছে আগে বল।"

লাবণী ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, সবকিছু শুনে সাজ্জাদ হতবাক হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

লাবণী মাথা নেড়ে বলল, "আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু যেটা ঘটেছে তোমাকে সেটাই বলেছি।"

সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করছে শারমিন?"

"বিছানায় বসে আছে। কেউ কাছে এলেই ভয়ংকর চেচামেচি শুরু করে।"

"চল গিয়ে একটু দেখি।"

শারমিন বিছানায় হাটুর উপর মুখ রেখে বসেছিল। ঘরটা অসম্ভব শীতল এবং বাতাসে এক ধরণের দূষিত গন্ধ। ঘরের বাতি নেভানো পাশের ঘর থেকে যা একটু আলো এসে পড়েছে তাতেই আবছা দেখা যাচ্ছে। সাজ্জাদ লাবণীকে বলল, "একটু লাইট জ্বালাও।"

লাবণী ফিসফিস করে বলল, "জ্বালাচ্ছি। খুব চিৎকার করবে কিন্তু।"

"করুক।"

লাবণী সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই শারমিন দুই হাতে মুখ ঢেকে জান্তব গলায় চিৎকার করতে থাকে। তার মুখে কাটা দাগ, শরীরের নানা জায়গায় রক্তের ছোপ, এলোমেলো চুল এবং চোখ মুখে অপ্রকৃতস্থ মানুষের ছাপ। সাজ্জাদ এগিয়ে গিয়ে শারমিনের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "শারমিন। মা আমার।"

শারমিন চিৎকার করে বলল, "মড়াখোগা জানোয়ার। আমার কাছে আসবি না। খবরদার।"

সাজ্জাদ বলল, "ছি মা। ছি। এভাবে কথা বলে না।"

"কাছে আসবি না তুই। খবরদার। খুন করে ফেলব তোকে।"

সাজ্জাদ অনুনয় করে বলল, "শারমিন। শোন মা। একটু শান্ত হ। প্লীজ। শারমিন—"

শারমিন দুই দিকে মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে বলল, "আমি শারমিন না। না—না—না—"

"তুই তাহলে কে?"

"আমি কাফ্রীদা। কা-ফ-রি-দা!" তারপর সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে খল খল করে হাসতে থাকে। শারমিনের চোখের দৃষ্টি দেখে সাজ্জাদ হতভম্ব হয়ে যায়। দেখে মনে হয় না এটি মানুষের দৃষ্টি।

সাজ্জাদ একটু এগিয়ে গিয়ে শারমিনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতেই শারমিন বন্য পশুর মতো জান্তব একটা শব্দ করে সাজ্জাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল, সাজ্জাদ প্রস্তুত ছিল না সে পা বেধে নিচে পড়ে গেলো। হিংস্র হায়েনা যেভাবে আক্রমণ করে অনেকটা সেভাবে শারমিন সাজ্জাদকে কামড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে। লাবণী ব্যাপারটা দেখেছে সে প্রস্তুত ছিল, ছুটে এসে কোনভাবে এসে শারমিনকে টেনে সরিয়ে নেয়। তার ফলটা হয় আরো ভয়ানক, শারমিন দেয়ালে মাথা ফুটে জান্তব এক ধরণের শব্দ করতে থাকে, দেখতে দেখতে তার চোখ মুখ রক্তাক্ত হয়ে যায়।

সাজ্জাদ এক ধরণের অসহায় আতংক নিয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, এখনও সে পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বিড় বিড় করে বলল, "মেডিক্যাল হেল্প দরকার। এক্ষুণি মেডিক্যাল হেল্প দরকার।"

লাবণী মাথা নাড়ল জিজ্ঞেস করল, "হাসপাতালে নেবে?"

"এভাবে হাসপাতালে নেব কেমন করে? একজন ডাক্তারকে ডাকি। এসে আগে ট্রাংকোয়ালাইজার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিক।"

লাবণী মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

সাজ্জাদের স্কুল জীবনের বন্ধু, ড. আরশাদ এখন মেডিক্যাল কলেজে নিউরলজীর হেড। তাকে সে যখন খুশী ফোন করতে পারে, রাত দুটোর সময়েও। সাজ্জাদ তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো, টেলিফোনে যতটুকু সম্ভব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল এবং ড. আরশাদ প্রায় সাথে সাথেই রওনা দিয়ে দিল। এতো রাতে রাস্তাঘাটে একেবারে ভিড় নেই, যে পথটুকু আসতে দিনের বেলা এক ঘন্টা থেকেও বেশি লেগে যায় ড. আরশাদ বিশ মিনিট থেকে কম সময়ে সেটুকু চলে এলো।

ড্রয়িংরুমে সাজ্জাদ আর লাবণী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় এবং ড. আরশাদ গম্ভীর মুখে পুরোটুকু শুনে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আই হোপ তোরা এটাকে সুপার ন্যাচারাল কিছু ভেবে বসিস নি।"

সাজ্জাদ আর লাবণী দুজনেই দ্বিধান্বিত ভাবে মাথা নাড়ল। লাবণী বলল, "না আমি ভাবতে চাই না।"

ড. আরশাদ বলল, মানুষের মস্তিষ্ক যে কোন সুপার ন্যাচারাল ফেনোমেনোন থেকে বেশি চমকপ্রদ। কোন একটা জিনিষ তাকে খুব ডিস্টার্ব করেছে। তার বয়স কতো?"

"আঠারো।"

"খুব সেনসিটিভ বয়েস।" ড. আরশাদ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের জানা মতে কোন ড্রাগের সমস্যা আছে?"

লাবণী মাথা নাড়ল, "না নেই।"

"কোন এফেয়ার?"

লাবণী আবার বলল, "সেরকম কিছু নেই। আজকালকার ছেলে মেয়েরা অনেক ফ্রী, ছেলে বন্ধু মেয়ে বন্ধু আছে। কিন্তু মনে হয় না কোন রিলেশনশীপ আছে।"

"শিওর?"

"শিওর। মেয়ে আমার সাথে খুব ফ্রী।"

"আপনাদের ফেমিলিতে কারো মানসিক সমস্যা আছে?"

দুজনেই মাথা নাড়ল, "না নেই।"

"আগে কখনো এ ধরণের কোন কিছু করেছে?"

"না করে নি।"

"ইদানীং কোন ঘটনা কী খুব এফেক্ট করেছে?"

লাবণী সাজ্জাদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "আপনি হয়তো জানেন আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। সেই ঘটনা তাকে এফেক্ট করেছিল। কিন্তু তারপর দুই বছর হয়ে গেছে। সে বেশ মেনে নিয়েছে।"

"মাথায় কী কখনো কোন রকম ব্যথা পেয়েছে?"

"না, পায় নি।"

"মাথা ব্যথা বা এ ধরণের কোন রকম কমপ্লেন করেছে?"

"না করে নি।"

"ঘুম হয় না এ ধরণের কোন কমপ্লেন করেছে?"

"না, করে নি।"

"জেনারেল হেলথ কেমন?"

"ভাল। বেশ ভাল।"

ড. আরশাদ চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ মাথা নাড়ল, তারপর বলল, "আপনার মেয়েকে একটু দেখি।"

"আসুন।"

ঘরে ঢোকা মাত্রই শারমিন অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে শুরু করল। শারমিন যে এ ধরনের গালাগাল জানে লাবণী সেটা জানতোই না। ড. আরশাদ খুব বিচলিত হলো না। বেশ সহজ ভাবে কাছে গিয়ে শারমিনের হাত ধরল, শারমিন ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু ড. আরশাদ তাকে ছাড়ল না। শারমিন ছটফট করতে শুরু করতেই লাবণী আর সাজ্জাদ দুপাশ থেকে তাকে শক্ত করে ধরে ফেলল। ড. আরশাদ তার পালস দেখল, ব্লাড প্রেশার মাপল, চোখের মনি দেখল, জিবের রং দেখল, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন একটা ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই।"

সাজ্জাদ আর লাবণী দুজনেই মাথা নাড়ল। ড. আরশাদ বলল "কাল ভোরে ওকে একটা ক্লিনিকে ট্রান্সফার করা যাক।"

সাজ্জাদ বলল, "ঠিক আছে।"

"আমি এ্যাম্বুলেন্স আর স্টাফ পাঠিয়ে দেব।"

সাজ্জাদ আবার বলল, "ঠিক আছে।"

ড. আরশাদ ইনজেকশান বের করতে গিয়ে থেমে গিয়ে লাবণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাবী, আপনি বলেছিলেন, শারমিন আয়নাতে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

আপনাদের বাসায় কী বড় আয়না আছে?"

"কেন?"

"একটা জিনিষ একটু ট্রাই করতাম। যেহেতু আয়নায় কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে, তাই সামনে বড় আয়না রেখে যদি দেখানো যেতো এটা হার্মলেস, হয়তো সে পুরোটা রিকভার করে ফেলতো।"

"কিন্তু—" লাবণী ইতস্তত করে বলল, "যদি উল্টো আরো বেশি ভয় পেয়ে যায়? যদি অন্য কিছু ঘটে যায়।"

ড. আরশাদ দুর্বল ভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, এখন যে স্টেজে আছে তার থেকে বেশি আর কী হবে? দেখি চেষ্টা করে। সিমিলার একটা কেসে একবার পেশেন্ট পুরোপুরি রিকভার করেছিল। আছে বড় আয়না?"

লাবণী বলল, "ড্রেসিং টেবিলে যেটা ছিল সেটা তো ভেঙ্গে ফেলেছে। বাথরুমে ফুল লেংথ আয়না আছে, কিন্তু সেটা তো দেয়ালের লাগানো।"

সাজ্জাদ বলল, "স্ক্রু ড্রাইভার আছে? ক্লীপ দিয়ে লাগানো থাকে, খুলে আনা যাবে।"

স্ক্রু ড্রাইভার খুঁজে পাওয়া গেলো না বলে রান্নাঘর থেকে একটা চাকু এনে সাজ্জাদ বাথরুম থেকে বড় একটা আয়না খুলে আনল। ড. আরশাদ সেটা শারমিনের সামনে ধরে বলল, "শারমিন। এদিকে তাকাও। তাকাও এদিকে।"

শারমিন তাকালো না। মাথা সরিয়ে চিৎকার করতে লাগল। ড. আরশাদ বলল, "তাকাও। তাকাও আয়নার দিকে।"

শারমিন তাকাল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। মুখ ঢেকে চিৎকার করতে লাগলো। ড. আরশাদ বলল "থাকুক।"

আয়নাটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে ড. আরশাদ তার ব্যাগ হাতে নেয়। ভেতর থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করে একটু ছোট কাঁচের এ্যাম্পুল থেকে ঘুমের ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে শারমিনের দিকে এগিয়ে গেলো। সাজ্জাদ আর লাবণী দুই পাশ থেকে শারমিনকে ধরে রাখল। ড. আরশাদ তখন তার হাতে ইনজেকশানটি দিয়ে দেয়।

ইনজেকশানের প্রায় সাথে সাথেই শারমিন খানিকটা নির্জীব হয়ে যায় এবং চোখ বন্ধ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে শুয়ে থাকে। ড. আরশাদ খানিকক্ষণ শারমিনকে লক্ষ্য করল। তারপর বলল, কিছুক্ষণেই এখন ঘুমিয়ে যাবে। ঘুম সহজে ভাঙবে না। একেবারে দুপুর পর্যন্ত ঘুমানোর কথা। আমরা সকালে ক্লিনিকে নিয়ে যাব।

সাজ্জাদ মাথা নেড়ে বলল, "থ্যাংকস আরশাদ। তুই না থাকলে যে আমি কী করতাম আমি জানি না।"

"তোরা চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন একটু বিশ্রাম নে।"

ড. আরশাদ চলে যাবার পর দুজন আবার শারমিনের ঘরে ফিরে এলো। তাদের পায়ের শব্দ শুনে শারমিন চোখ খুলে তাকায়, আরশাদ বলেছিল ঘুমিয়ে যাবে কিন্তু শারমিন এখনো ঘুমায় নি। সাজ্জাদ কাছে এগিয়ে গিয়ে বিছানায় তার পাশে বসল, অন্যবার যেরকম চিৎকার করে গালাগাল শুরু করে দিতো এবার সেরকম কিছু করল না। সাজ্জাদ তার মাথায় হাত রাখল, শারমিন দুর্বল ভাবে হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে ফিস ফিস করে কিছু একটা বলল। সাজ্জাদ ভাল করে শুনতে না পেয়ে মাথাটা আরেকটু এগিয়ে দিয়ে বলল, "কী বললি, শারমিন?"

"পারবি না। তোরা পারবি না।"

"কী পারব না।"

"এই মেয়েটাকে বাঁচাতে পারবি না। আমি এই মেয়েটাকে নিব।"

সাজ্জাদ বলল, "ছিঃ এইভাবে কথা বলে না শারমিন।"

"তোর বউ ঠিক কথাই বলেছে।"

সাজ্জাদ চমকে উঠে শারমিনের দিকে তাকাল, শারমিনের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠে, ফিস ফিস করে বলে "তোর মেয়ে মুখে রক্ত উঠে মরবে। মরবেই মরবে।"

"কী বলছিস তুই!"

শারমিনের মুখে হাসিটা আরও বিস্তৃত হয়, সে খলখল করে হাসতে হাসতে বলল, তোর বউয়ের পেটে বাচ্চাটা আছে সেটাও মরে যাবে! কেমন করে মরবে জানিস?"

"কেমন করে?"

"তুই মারবি। তুই তুই!"

সাজ্জাদ বিস্ফারিত চোখে শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। শারমিন ভয়ংকর ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে বলল, "কেন মারবি জানিস?

"কেন?"

"কারণ বাচ্চাটা তোর না! তোর বউ তোকে ঠকিয়েছে। বুড়া হাবড়া কোথাকার—"

সাজ্জাদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টর মতো উঠে দাঁড়াল, এক ধরণের অবিশ্বাস নিয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। লাবণী একটু দূর দাঁড়িয়েছিল বলে শারমিন কী বলছে শুনে নি। এবারে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে সাজ্জাদ?"

সাজ্জাদ কোন কথা না বলে হতচকিতের মতো একবার শারমিনের দিকে আরেকবার লাবণীর দিকে তাকালো। লাবণী আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী বলেছে শারমিন?"

সাজ্জাদ ফিস ফিস করে বলল, "না কিছু না।" তারপর লাবণীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাত দিয়ে শারমিনকে দেখিয়ে বলল, "এ শারমিন নয়।"

"কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি জানি এ আসলেই কাফ্রীদা!"

শারমিন বিছানায় নির্জীবের মতো শুয়ে থেকে খল খল করে হাসতে থাকে।

ড. আরশাদ বলেছিল শারমিন কয়েক মিনিটের মাঝে ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু সত্যি সত্যি যখন শেষ পর্যন্ত সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন এক ঘণ্টা থেকেও বেশি সময় পার হয়েছে। এই সময়টুকু লাবণী শারমিনের হাত ধরে বসেছিল। শারমিন ফিস ফিস করে দুর্বোধ্য প্রলাপ বকেছে, লাবণী সেগুলো শুনেছে, শুনে সেও ফিস ফিস করে শারমিনের সাথে কথা বলেছে। কাফ্রীদার ভেতর কোথাও তার আদরের শারমিন লুকিয়ে আছে সে সেই শারমিনের সাথে কথা বলে গেছে। কাফ্রীদা তাকে বলতে দিতে চায় না কিন্তু সে তবু

বলেছে। ভয়ংকর এই দানবের হাতে আটকে পড়া তার ছোট মেয়েটিকে সে সাহস দিয়েছে শান্তনা দিয়েছে আদর আর ভালবাসা দিয়েছে। তার আদরের শারমিন সেটা বুঝতে পেরেছে কী না সে জানে না, কিন্তু সে এক মূহুর্ত্তের জন্যেও থামে নি।

শারমিন যখন শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে গেছে তখন লাবণী বাইরের ঘরে এসেছে। সেখানে সোফায় সাজ্জাদ চুপচাপ দুই গালে হাত দিয়ে বসেছিল। লাবণীকে দেখে বলল, "ঘুমিয়েছে?"

লাবণী মাথা নাড়ে, "হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে।"

"আরশাদ বলেছিল, কয়েক মিনিটে ঘুমাবে, আসলে কতো সময় লেগেছে দেখেছ?"

"আমিও তাকে একটা সিডেটিভ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম। তারপরেও উঠে গেছে।"

"কোন একটা কারণে মেটাবলিজম খুব বেশি।"

দুজন চুপচাপ বসে থাকে, দীর্ঘ দুই বছর পর একজন আরেকজনকে দেখছে, দুজনের মনেই ছোটখাট কথা এসে ভীড় করছে কিন্তু বলতে পারছে না। শারমিনের বিষয়টা এমন একটা চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে যে দুজনের কেউ আর অন্য কিছু ভাবতে পারছে না। সাজ্জাদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি নিজের চোখে না দেখলে এটা বিশ্বাস করতাম না।"

লাবণী বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেও এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"এমন কিছু কথা বলেছে যেটা ওর জানার কথা না।"

লাবণী কোন কথা না বলে সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সাজ্জাদ মাথা নেড়ে বলল, "ভয়ংকর ভয়ংকর সব কথা।"

লাবণী বলল, "আমি আজ সারাদিন ভূত প্রেত দানব আর ব্ল্যাক আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছি। সেখানে লেখা আছে এরা যখন কোন মানুষকে বশ করে ফেলে তখন তার মুখ দিয়ে যেসব কথা বলে সেগুলো বেশিরভাগ হয় মিথ্যা। ভয় দেখানোর জন্যে ভয়ংকর ভয়ংকর কথা।"

সাজ্জাদ মাথা নাড়ল, বলল, "আমাকে যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো মিথ্যা না।"

"হতে পারে।" লাবণী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বইয়ে লেখা আছে পশু পাখী পোকা মাকড় নাকি ওদের উপস্থিতি বুঝতে পারে। যখন ওরা আসে তখন নাকি সব জন্তু জানোয়ার পোকা মাকড় পালিয়ে যায়। এখানে কতো মশা কিন্তু ঐ ঘরে একটি মশাও নেই। দেয়ালে টিকটিকি পর্যন্ত নেই।"

সাজ্জাদ বলল, "ঘরটা কেমন ঠাণ্ডা।"

"হ্যাঁ, বইগুলোতে সেটাও লেখা আছে। ঘরে মাংশ পচার মতো এক ধরণের গন্ধ হবে।"

সাজ্জাদ মাথা নাড়ে, বলে, "হ্যাঁ পচা একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।"

"সবচেয়ে ভয়ংকর কথা কী জান?"

"কী?"

"এরা শক্তি পায় কোথা থেকে জান?"

"কোথা থেকে?"

"অন্যের প্রাণ থেকে। একটা করে জীবন্ত প্রাণ নেয় আর তখন সেই জীবনীশক্তিটা পেয়ে যায়। সে জন্যে এরকম সময় ঘরে কোন জীবিত প্রাণী রাখতে হয়, পাখী কুকুর বিড়াল—"

"সেগুলো মেরে ফেলে?"

"তাই পড়েছি। সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে মানুষ মারতে।"

"মানুষ?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে চেষ্টা করবে শারমিনের কিছু করতে?"

না—না—শারমিন হচ্ছে ওর হোস্ট। শারমিনের উপর ভর করে সে টিকে আছে। তাই শারমিনের কিছু করবে না। অন্যদের করবে। কাছাকাছি মানুষের, আপনজনের।"

"সাজ্জাদ বলল, তার মানে তোমার কিংবা আমার?"

"হ্যাঁ। তোমার কিংবা আমার।"

লাবণীর কথা শেষ হবার আগেই সাজ্জাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়, চাপা গলায় বলে, "হায় খোদা!"

"কী হয়েছে?" বলে লাবণী সাজ্জাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকায় এবং সাথে সাথে তার শরীর পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়।

শোয়ার ঘরের দরজা দিয়ে শারমিন বের হয়ে আসছে। সে দুই হাতে শক্ত করে একটা চাকু ধরে রেখেছে—চাকুটা লাবণী আর সাজ্জাদ দুজনেই চিনতে পারল। ড. আরশাদের জন্যে বাথরুম থেকে আয়নাটা খুলে আনতে গিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার খুঁজে না পেয়ে এই চাকুটা সে রান্নাঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিল। চাকুটা ভুল করে শোয়ার ঘরে রেখে এসেছিল, শারমিন ভুল করে নি সেটা তুলে এনেছে।।

সাজ্জাদ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কী ভয়ংকর চেহারা শারমিনের, মাথার চুলগুলি উড়ছে, চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, মুখে ভয়ংকর একটি ক্রুর হাসি। সাজ্জাদ ছুটে গিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, লাবণী তাকে থামালো। শারমিন দুই হাতে চাকুটা আরো একটু ওপরে তুলে লাবণীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

লাবণী, নিচু গলায় বলল, "শারমিন।"

শারমিন হিস হিস করে উঠে, "আমি শারমিন না!"

লাবণী তীব্র গলায় বলল, "অবশ্যই তুই শারমিন। আমি জানি তুই শারমিন। তোকে আমি পেটে ধরেছি, বুকে চেপে বড় করেছি। তুই শারমিন!"

শারমিন খ্যাপার মতো দুই পাশে মাথা নাড়ল, বলল, "না—না—না আমি শারমিন না। আমি কাফ্রীদা।"

"কাফ্রীদা একটা দানব। তার জায়গা হবে দোজখে—" লাবণী চিৎকার করে বলল, "আমার সোনামনি শারমিনের উপরে কোন দানব থাকতে পারবে না। যা তুই দানব, দূর হয়ে যা—"

"যাব না। আমি যাব না—"

লাবণী আকুল হয়ে বলল, "সোনামনি শারমিন মা আমার, তুই কারো কথা শুনবি না। তুই শুধু আমার কথা শোন—আমি জানি তুই আমার কথা শুনছিস। আয় মা তুই আমার কাছে। তুই জেগে ওঠ, ঝাড়া দিয়ে এই নোংরা ময়লা জানোয়ারটাকে, এই দানবটাকে ফেলে দে। আমি জানি তুই পারবি! তুই পারবি—"

শারমিন চাকু হাতে আর দুই পা এগিয়ে আসে, খলখল করে হেসে ওঠে বলে, "পারবি না তুই! পারবি না আমার সাথে। আমি কাফ্রীদা! অনেকদিন পর আমি ছাড়া পেয়েছি, আমার অনেক খিদে পেয়েছে। আমাকে এখন খেতে হবে খেতে হবে—"

লাবণী বলল, "শারমিন মা আমার! তুই আমার চোখের দিকে তাকা। একবার তুই আমার চোখের দিকে তাকা। আমি তোর আম্মু! মনে নাই তোর, তোকে আমি বুকে করে মানুষ করেছি! আয় মা তুই আমার কাছে, তোকে বুকে জড়িয়ে ধরব! আমার বুকটা খা খা করছে—"

"তোর বুকে আমি চাকু বসাব। রক্তের বন্যা হবে এখানে—"

"না!" লাবণী চিৎকার করে বলল, "না! না! না! শারমিন তুই তোর মায়ের বুকে চাকু বসাতে দিবি না! তুই জেগে ওঠ, জেগে উঠে দেখ তোকে কী করছে! এই দানব তোর হাতে করে চাকু ধরিয়ে আনছে তোর আম্মুকে খুন করার জন্যে। তুই কী পারবি কখনো? পারবি না—ছুঁড়ে ফেলে দে চাকু, আয় আমার কাছে মা। আয়। আমার চোখের দিকে তাকা! আমি জানি তুই আছিস! আমি জানি তুই আছিস, তুই আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস!"

শারমিনের মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠে। লাবণী তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শূন্যে অপ্রকৃতস্থ একটা দৃষ্টিতে হঠাৎ এক ধরণের জীবনের স্পন্দন দেখা যায়। লাবণী সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে শারমিনের ভয়ংকর ক্রুর মুখটিতে হঠাৎ ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠছে। দুই চোখে হঠাৎ গভীর ভালবাসা

আর গভীর বেদনার আভাস দেখা দিতে থাকে। লাবণী এক পা অগ্রসর হয়ে বলে, "আয় মা আমার। আমার বুকে আয়—তোর জন্যে আমি পাগল হয়ে অপেক্ষা করছি! আয় মা আমার—"

শারমিন এক পা অগ্রসর হয়, হঠাৎ করে তার পা টলে উঠে, দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখা চাকুটা হাত থেকে খুলে নিচে এসে পড়ে। শারমিন এক পা এগিয়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কেঁদে উঠে, "আম্মু, আম্মু—তুমি কোথায় ছিলে?"

শারমিন তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে চোখে মুখে চুমো দিয়ে বলল, "এই তো আমি আছি তোর সাথে। এই দেখ মা—"

"আমার খুব ভয় করছে মা। খুব ভয় করছে—"

"তোর কোন ভয় নেই। আর কোন ভয় নেই।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

শারমিনের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠে এবং হঠাৎ করে সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে যায়। লাবণী বলল, "সাজ্জাদ ওকে একটু ধরো। আমি একা পারছি না।"

সোফায় শুইয়ে রেখে লাবণী শারমিনের মুখে নিজের মুখ স্পর্শ করে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বেডরুম থেকে তুমি একটা চাদর এনে দেবে প্লীজ। শারমিনের মনে হয় শীত করছে—"

চাদর না নিয়েই সাজ্জাদ এক মূহর্ত পরে ফিরে এলো। তার মুখ ফ্যাকাসে এবং হাত অল্প কাঁপছে। লাবণী অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে।"

"তুমি বিশ্বাস করবে না! তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না—"

"কী বিশ্বাস করব না?"

"শোয়ার ঘরে যে আয়নাটা ছিল—"

"কী হয়েছে সেই আয়নাটার?"

"সেই আয়নার ভিতরে ভয়ংকর একটা মূর্তি!"

লাবণী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "খবরদার ওটা ছুবে না! খবরদার—"

"কী হবে ছুলে?"

"আবার বের হয়ে যাবে।"

"তাহলে কী করব?"

"আরেকটা আয়না খুলে আনো, তারপর এই আয়নাটার ওপর সেটা মুখোমুখি বসিয়ে দাও। তাহলে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব হয়ে এই দানব যুগের পর যুগ আটকা পড়ে যাবে! দূর থেকে দূরে চলে যাবে—"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। তুমি যাও দেরী করো না। আমি শারমিনকে ছেড়ে যাব না।"

সাজ্জাদ যখন দ্বিতীয় আয়নাটা খুলে নিয়ে আসে তখন আয়নার ভেতরে আটকা পড়ে থাকে ভয়ংকর মূর্তিটার মাঝে অস্বাভাবিক একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সেটি ভেতরে ছটিপুটি খায়, ছটফট করে এবং যখন দুটি আয়না কাছাকাছি এসে প্রতিবিম্বের ভেতর প্রতিবিম্ব দিয়ে একটি অসীম সুরঙ্গের মতো সৃষ্টি হয় সেটি ছটফট করতে করতে সেই সুরঙ্গ দিয়ে অতলে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাজ্জাদ তারপরেও কোন ঝুঁকি নিল না। দুটো আয়না শক্ত করে বেঁধে রাখল। তার পরিচিত এক বন্ধুর সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি আছে। বিশাল ফার্নেসে সেখানে সবকিছু গলিয়ে ফেলা যায়। এই দুটি আয়নাকে এভাবে রেখেই সে গলিয়ে ভস্ম করে দেবে। কাফ্রীদা নামের দানব যেন আর কোনদিন ফিরে আসতে না পারে।

ভোরবেলা নাস্তার টেবিলে শারমিন খেতে বসেছে। সাজ্জাদ শারমিনের মাথায় হাত বুলিয়ে, বলল, "আমি এখন যাই।"

শারমিন বলল, "আমাদের সাথে নাস্তা করে যাও।"

সাজ্জাদ লাবণীর দিকে তাকালো, লাবণী বলল, "হ্যাঁ। নাস্তা করে যাও। আয়োজন খুব ভাল নয়—আগেই বলে রাখছি।"

সাজ্জাদ এক সময়ে তার জন্যে নির্ধারিত যে চেয়ার ছিল সেটাতে বসে বলল, "এর চাইতে ভাল আয়োজন কী আমার জন্যে আমি কখনো পাব?"

লাবণী কোন কথা বলল না। শারমিন বলল, "পাবে আব্বু। তুমি পাবে। তুমি ইচ্ছে করলেই পাবে।"

সাজ্জাদ লাবণীর দিকে তাকালো। লাবণী খুব সাবধানে তার চোখের কোনা মুছে নিয়ে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সাজ্জাদের দিকে তাকাল, বলল, "কী খাবে তুমি? চা না কফি?"